দ্বিতীয় অধ্যায়
মালদহ জেলার পরিচয়

ক ঐতিহাসিক পরিচয়

জেলা গঠনের ইতিহাস, মালদহের নামকরণ প্রসঙ্গ ঃ

'মালদহ' নামকরণের উৎস নিয়ে নানারকম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বহুদিন থেকেই হয়ে আসছে, 'মাল' এবং 'দহ' শব্দ দুটির আলাদা আলাদা বিচার বিশ্লেষণ করে 'মালদহ' নামের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বহুচর্চিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন কোন গবেষকের মতে প্রাচীন 'মলদ' জাতির নাম থেকেই মালদহ নামের সূচনা। অর্থাৎ 'মলদ' 'দহ' 'মালদহ'। নিম্নবর্গীয় হিন্দুরূপে পরিগণিত আদিম অধিবাসী যারা কলিঙ্গ ও গঙ্গা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাস করতেন তারাই 'মলদ'।

'মাল' শব্দের বহু অর্থ করেছেন পন্ডিতেরা— 'মাল' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পাহাড়িয়া জাতি, 'মাল' শব্দের অর্থ 'মাল' অর্থাৎ 'উচ্চ ভূমি'। মেগাস্থিনিসের Molindai কে মালদহ বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

ফারসী শব্দজাত 'মাল' ঐশ্বর্য অর্থে ব্যবহৃত। আরবি ভাষাতেও একই অর্থে 'মাল' শব্দ ব্যবহার হয়। আবুল ফজল তাঁর গ্রন্থ 'আইন-ই আকবরী' তে 'মালদহ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

'দহ' শব্দ হ্রদের অপভ্রংশ, বাংলায় 'দহ' শব্দের অর্থ 'জলাময়' স্থান। ফরাসি শব্দ 'মালাদই'— মালাডিহিতে পরিণত হয়েছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নদীবন্দর বা বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল মালদহ। মালদহকে Lake district of Bengal বলে চিহ্নিত করা হয়েছে পরবর্তীকালে। মালদহ জেলার ভূপ্রকৃতিও সে কথাই সমর্থন করে। 'মাল পাহাড়ী' জাতি বরেন্দ্রী অঞ্চলে বসবাস করে, বরেন্দ্রী অঞ্চলে 'মাল' অর্থাৎ উচ্চভূমিরও দেখা মেলে। [১]

এক কালে বাংলার রাজধানীর সঙ্গে যুক্ত এই মালদহ জেলা— অর্থাৎ প্রাচীন রাজধানীর আধুনিক জেলার নানা ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে থাকে এই আধুনিক জেলা। শশাঙ্কের রাজধানী 'গৌড়' এই মালদহ জেলারই ঐতিহ্য— এই ঐতিহ্য রাজনৈতিক— সাংস্কৃতিক— ধর্মীয় এবং ইতিহাসগতও বটে। তাই গৌড় বাদ দিয়ে মালদহ জেলাকে কখনই ভাবা যায় না। যে গৌড় ছিল বৃহদাকার, রাজকীয়, মর্যাদা ও সম্ভ্রমবোধের পীঠস্থান, তা আজ স্মৃতি মাত্র। 'গৌড়' এবং 'বঙ্গ' একে অপরের পরিপূরক ছিল—এ থেকেই 'গৌড়বঙ্গ'-এর উৎপত্তি। এই 'গৌড়বঙ্গের' অধিপতিরাই 'বঙ্গেশ্বর', 'গৌড়েশ্বর' বা 'গৌড়াধিপ' উপাধি ধারণ করতেন। ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে 'বঙ্গ' এবং

‘গৌড়’ এর উল্লেখ আছে যথাক্রমে বৈদিক সাহিত্যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে খ্রী:পূ: পঞ্চম শতকে পাণিনির ‘অষ্টাধ্যয়ী’ গ্রন্থে। সমগ্র উত্তরাপথের এক ব্যাপক নাম ‘ গৌড়’, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে প্রাচীন গৌড় দেশের উল্লেখ আছে। এছাড়াও ষষ্ঠ শতাব্দীতে আলংকারিক দন্ডী ‘গৌড়ীয় রীতি’-র কথা উল্লেখ করেছেন। জ্যোতির্বিদ পরাশর খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে ‘গৌড়’ রাজ্যের উল্লেখ করেছেন। সপ্তম শতকে বরাহমিহিরের ‘বৃহৎসংহিতা’-য় গৌড়, পৌন্ড্র ও বর্ধমান স্বতন্ত্র জনপদরূপে উল্লিখিত।.

‘স্কন্ধপুরাণ’-এ সরস্বতী তীরস্থ, কনৌজ, উৎকল, মিথিলা ও গৌড়— ‘পঞ্চগৌড়’ নামে উল্লেখ্য। উত্তর ভারতের বৃহত্তর অংশের এই পঞ্চগৌড় মধ্যযুগের সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারও মতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুম্ভ ও পুন্ড্র ছিল ‘পঞ্চগৌড়’। পৌন্ড্রবর্ধনভুক্তি, বরেন্দ্রভূমি, উত্তরবঙ্গ প্রভৃতি আলাদা আলাদা নামেও ‘গৌড়’ পরিচিত ছিল। কখনও গৌড়কে পৌন্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত হতেও দেখা গেছে। পৌন্ড্রবর্ধনের অধিপতিকেও বলা হয়েছে ‘গৌড়েশ্বর’। ‘গৌড়’ এক সময় মগধ ও পাটলিপুত্রের মধ্যেও অন্তর্লীন ছিল। সমগ্র আর্য্যাবর্ত বা উত্তরভারত অভিহিত হত ‘গৌড়’ নামে। গৌড়ের সীমা বিহার, উড়িষ্যা, কামরূপ, পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের সীমান্ত ছুঁয়ে ছিল কোন এক সময়ে। প্রাচীন কালের এই বৃহত্তর গৌড় কালক্রমে ছোট হতে হতে দক্ষিণ মালদহের সংকীর্ণ গণ্ডিতে পাতালচণ্ডী, পিয়াসবাড়ি, রামকেলি, মহদিপুরে এসে ঠেকেছে।

মালদহ জেলার চৌহদ্দির মধ্যে অবস্থিত মধ্যযুগীয় মুসলিম সুলতানি আমলের রাজধানী প্রায় গুড়িয়ে যাওয়া গৌড়, পান্ডুয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।

প্রাচীন এবং মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে মালদহের গুরুত্ব অপরিসীম। পাল আমলের শেষ দিক থেকে সেন আমল এবং মুসলিম আমলের পুরো সময় ধরে বঙ্গদেশের শাসনকেন্দ্র বা রাজধানীর অবস্থান ছিল মালদহের সীমানার মধ্যেই। পাল সম্রাট রামপালের রাজধানী ‘রামাবতী’ অবস্থিত ছিল এই জেলারই ‘অমৃতি’ নামক স্থানে। সেন আমলে বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের রাজধানীও ছিল এই জেলাতেই। লক্ষ্মণ সেনের নাম থেকেই গৌড়ের নাম লক্ষ্মণাবতী হয়েছিল। এরপর শুরু হয় মুসলিম শাসনের যুগ। কুতুবুদ্দিন আইবকের প্রতিনিধি ইকতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খলজি ‘গৌড়’ জয় করেছিলেন ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে। বর্তমান মালদহ শহরের দক্ষিণ ও উত্তর সীমান্তে অবস্থিত ‘গৌড়’ ও ‘পান্ডুয়া’ পর্যায়ক্রমে ছিল মুসলিম বাংলার রাজধানী। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাজা গনেশ মুসলিম শাসনের অবসান ঘটিয়ে দখল করেছিলেন বাংলার সিংহাসন। এবং অল্প দিনের জন্য হলেও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হিন্দুরাজত্ব। বাংলার এই বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল মালদহের পান্ডুয়ায়। সুলতানি আমলে বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতান নাসিরুদ্দিন মামুদশাহের পুত্র রুকনুদ্দিন বারবক শাহের শাসনকালে রাজধানী পান্ডুয়া থেকে ‘গৌড়ে’ স্থানান্তরিত হয়।

মালদহ জেলার উত্তরে জাতীয় সড়কের ধারে অবস্থিত (ইংরেজবাজার থেকে ১১ মাইল) ‘গৌড়’ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই চলে আসে অধুনা ‘পান্ডুয়া’-র কথা। পান্ডুয়ার প্রাচীন ইতিহাসও

গৌড়ের মতই সমৃদ্ধশালী। বর্তমানে এই স্থান মুসলিম যুগের পুরাকীর্তিতে সমৃদ্ধ। উইলসন সাহেব 'পুন্ড্র' বলতে বাংলা ও বিহারের নিম্ন জেলাগুলির উল্লেখ করেছেন। যার মধ্যে মালদহকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বর্তমানে সৌধ, দীঘি ও মসজিদ প্রভৃতিতে অকীর্ণ পান্ডুয়াতে মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শন মেলে।

প্রাচীন পৌন্ড্রবর্ধনের বর্তমান নাম পান্ডুয়া। একদিন বঙ্গদেশের বিচিত্র রাজধানীর সৌধমালার গৌরব বাড়াত এই পান্ডুয়া। পরবর্তীতে পাঠান রাজত্বকালে এই স্থানে এক মহাবিপ্লবের ইতিহাস রচিত হয়। ক্রমান্বয়ে কয়েকজন পাঠান শাসক এই ভূখণ্ডে রাজত্ব করেন— সিংহাসনের দখল নিয়ে সংঘাত লেগেই ছিল। বখতিয়ার খিলজীর পরে মোহম্মদ সেরান খাঁ, তাঁর পরে আলিমর্দ্দন খিলজী এবং তাঁকে নিহত করে গিয়াসুদ্দিন ক্ষমতায় আসেন। দিল্লীর আদেশে শাহাজাদা নাসিরুদ্দিনের আক্রমণে গিয়াসুদ্দিন হত হন। নাসিরুউদ্দিন-আলাউদ্দিন দৌলত শাহ কর্তৃক পরাস্ত হন। এই রকম মহাবিপ্লবের দিনে বাংলায় পাঠান ভূপতিরা স্বাধীন হয়ে ওঠেন। হাজি ইলিয়াস সেই কালে যে স্বাধীন পাঠান রাজত্বের পত্তন করেন— 'পৌন্ড্রবর্ধন' সেই স্বাধীন রাজ্যের রাজধানী। ১৩৪৬-১৩৯১ পর্যন্ত এই রাজত্বকাল চলে। সম্রাট আকবরের সূচনা পর্যন্ত বাংলায় স্বাধীন পাঠান রাজ কায়েম ছিল। ইলিয়াস রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা সেকেন্দার শাহ (১৩৫৮-১৩৯০ খ্রিস্টাব্দে) প্রতিষ্ঠা করেন বর্তমানের আদিনা মসজিদ (১৩৬৯)। পিতাকে হত্যা করে সেকেন্দার শাহের পুত্র আজম শাহ দীর্ঘকাল শাসন করেন গৌড়ে। ১৩৯৭ খ্রিস্টাব্দে ভাতুড়িয়ার হিন্দু রাজা গনেশ বাহুবলে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন, এঁর রাজত্বকালে হিন্দু-মুসলমান মিলিত হয়ে এক রাজনৈতিক মহাজাতিতে পরিণত হয়েছিল। এঁর পুত্র জাঠমল্ল বা যদু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহ নামে দীর্ঘকাল সগৌরবে রাজ্য পালন করেছিলেন। এই ভূমিতেই হিন্দুর অস্তাচল, মুসলমানের উদয়াচল, গৌড়ীয় সাধুভাষার জন্মভূমি — এই ভূমির প্রসিদ্ধি বলার অপেক্ষা রাখে না।[২]

বৌদ্ধ প্রভাব :

ভারতবর্ষ মিশ্র সংস্কৃতির দেশ। প্রাগার্য যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সনাতন সংস্কৃতি ধারার সঙ্গে— দ্রাবিড় > আর্য >বৌদ্ধ >জৈন > শক > হুন > পাঠান > মোঘল > ইংরেজ, বহিরাগত এইসব জাতি মিশেছে। এই সব ধর্মের ধর্মগুরুরা তাঁদের ধর্মাদেশ দ্বারা প্রচিলত ধর্মের বিস্তার করেছেন বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণের মাধ্যমে। মালদহ জেলাতেও বহুপ্রাচীন কাল থেকে এই রকমই বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব চোখে পড়ে। সুপ্রাচীন কাল থেকেই মালদহের বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির পাশাপাশি বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির বিস্তার ইতিহাস সম্মত।

গুপ্ত রাজত্বকালে বাংলায় প্রথম বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। হিউয়েন সাঙ-এর কথায় পুন্ড্রবর্ধনে ও বাংলায় কুড়িটি সংঘারামের ও মহাযান মতাবলম্বী মিলিয়ে তিন সহস্র ধর্মযাজক ছিল। এছাড়া কর্ণসুবর্ণ, পুন্ড্রবর্ধনে দুটি বৌদ্ধ মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাও বলেছেন।

বৌদ্ধ-পাল-দেব-চন্দ্র রাজাদের শাসনকালে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে। সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধ পাল রাজাদের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম অধিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। অনুমান যে এই সময়েই মালদহের মাধাইপুর, রহনপুর, চতে মেহেরপুর ও গণিপুরের বৌদ্ধ বিহারে বৌদ্ধরা থাকতেন। বরেন্দ্র অঞ্চলে পাল রাজাদের পৃষ্টপোষণায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রশ্নাতীত ছিল। পাল রাজত্বের পরবর্তী সময়ে সেন রাজত্বকালেও বৌদ্ধধর্ম পৃষ্টপোষণা পেয়েছিল।

মালদহ থানার শান্তিপুর (জেএল নং ১১৭) মৌজায় একটি বৌদ্ধ মূর্তি, মালদহ জেলার হবিবপুর থানার অন্তর্গত ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে জগজীবনপুর গ্রামে মহেন্দ্রপালের তাম্রলিপি, বৌদ্ধবিহার, — ইত্যাদির আবিষ্কার ও অবস্থান প্রমাণ করে পৌন্ড্রবর্ধন অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিপত্তি। বামনগোলা থানার জগদলা অঞ্চলে অপর একটি (রামপালের সমকালের) বৌদ্ধ বিহারের সন্ধান পাওয়া যায়। এছাড়া গোটা পৌন্ড্রবর্ধনে বহু দীঘি, পুকুর ও সৌধ বৌদ্ধ ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।[৩]

পাল রাজবংশের প্রভাব

বঙ্গদেশে বহু প্রাচীনকাল থেকেই গৌড় গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাংলার শাসক সমূহের মধ্যে পাল রাজারা সুদীর্ঘকাল (অন্তত: তিনশত বৎসর) রাজত্ব করেছিলেন।

গোপালদেব পালবংশের প্রথম রাজা। এ বংশের সকলেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী । গোপালের পুত্র ধর্মপাল সমগ্র আর্যাবর্ত জয় করে সার্বভৌম সম্রাটের পদ লাভ করেন। তাঁর পুত্র দেবপাল মগধ জয় করেছিলেন। পাল রাজগণের দ্বারা নালন্দা বিহারের বিস্তর উন্নতি সাধিত হয়। মালদহে প্রাপ্ত খালিমপুর তাম্রশাসন ধর্মপালের বিজয় রাজ্যের ৩২ সম্বৎসরে খোদিত। দেবপালের পর শূরপাল প্রথম এবং মহেন্দ্রপাল স্বল্পকালের জন্য রাজত্ব করেন। এর পর উল্লেখযোগ্য রাজা হিসেবে বিগ্রহ পালের (দ্বিতীয়) পুত্র মহীপাল (প্রথম) আনু: ৯৪৮ খ্রিঃ সিংহাসনারোহন করেন। প্রায় অর্ধশতাব্দী গৌরবের সঙ্গে রাজত্ব করেন। মহীপালের খ্যাতি শুধুমাত্র লিপি বা গ্রন্থেই সীমাবদ্ধ নয়। যুক্ত বাংলার বহুস্থান, দীঘি ও লোকগাথায় তাঁর নাম আজও স্মরণ করে মানুষ। প্রথম মহীপালের পর তাঁর পুত্র নয় পালের সময়ে অতীশ দীপঙ্কর বিক্রমশিলা বিহারের প্রথম অধ্যাপক হন। এরপর বিগ্রহ পালদেব (তৃতীয়) মহীপালদেব (দ্বিতীয়) — শূরপালদেব— রামপালদেব ক্রমান্বয়ে ক্ষমতায় ছিলেন। বরেন্দ্র উদ্ধারের জন্য সামন্ত রাজাদের সাহায্যে কৈবর্ত বিদ্রোহ দমন করেন— কৈবর্ত নায়ক ভীমকে বধ করেন রামপালদেব। রামপালের কণিষ্ঠপুত্র মদন পালের (আনুমানিক ১১৪৩-১১৬২ খ্রিঃ) রাজত্বকালের একটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে। মালদহ জেলার কালিন্দ্রী নদীর তীরে মদনপালের রাজধানী ছিল বলে অনেকে মনে করেন।

মালদহ জেলায় পাল রাজাদের তিনটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে — ১) ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন (পাওয়া যায় গৌড়ের সন্নিকটে)। ২) দ্বিতীয় গোপালদেবের জাজিলপাড়া তাম্র শাসন (মালদহের গাজল থানার জাজিল পাড়া থেকে প্রাপ্ত)। ৩) মহেন্দ্র পালের জগজীবনপুর তাম্র শাসন (মালদহ জেলার হবিবপুর থানার জগজ্জীবনপুর, তুলাভিটার উত্তরপূর্ব দিক থেকে প্রাপ্ত)। পাল রাজারা প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও অন্যান্য ধর্মের প্রতিও তাঁদের শ্রদ্ধা কম ছিল না। তাঁদের শাসন ব্যবস্থায় বাংলা তথা গৌড় ভূমিতেও শিক্ষা-সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্য ভাষ্কর্যের প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। এই রাজত্বকালে প্রাপ্ত বাংলা লিপি, স্থাপত্য, পাথরের মূর্তি, চিত্রকলা প্রভৃতির প্রভাব মালদহ জেলাকে তথা বাংলাকে আধুনিক কালেও গৌরবান্বিত করে চলেছে। [৪]

সেন বংশ

পাল রাজবংশের পর বাংলায় সেন রাজবংশের সূত্রপাত। সেন রাজারা দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশের (ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়) অধিবাসী ছিলেন। সামন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন (বৃষভশংকরগৌড়েশ্বর উপাধি) আনুমানিক ১০৯৭-১১৬০ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়রাজ মদনপালকে পরাজিত করে সুদৃঢ় রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এঁর পুত্র গৌড় দুর্গের নির্মাতা বল্লাল সেন (আনুমানিক ১১৫৮-১১৭৮ খ্রী:) সেন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থদ্বয় 'দানসাগর', 'অদ্ভুত সাগর'। কৌলিন্য প্রথার সঙ্গে তাঁর নামটি বিশেষভাবে জড়িত। বল্লাল সেনের রাজত্বকালেই সদুল্লাপুরের নিকটবর্তী 'সাগরদীঘি' 'কাজলদীঘি' খনিত হয়।

বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে উত্তরে গৌড়, পূর্বে কামরূপ, দক্ষিণে কলিঙ্গ পর্যন্ত সেন সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। বহু গ্রন্থের রচয়িতা পন্ডিত হলায়ূধ লক্ষ্মণ সেনের ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। জয়দেব (গীতগোবিন্দ), শরণ, উমাপতিধর, গোবর্ধন আচার্য্য (আর্যা সপ্তসতী) ধোয়ী (পবনদূত), শ্রীধর দাস (সদুক্তি কর্ণামৃত), সর্বানন্দ (অমর কোষ) লক্ষ্মণ সেনের সমকালের উল্লেখযোগ্য কবি পণ্ডিতকূল। লক্ষ্মণ সেনের নাম অনুসারে রাজধানী লক্ষ্মণাবতী (লখনৌতি)।

সেন রাজত্বকালে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কঠোর শৃঙ্খলা ও রক্ষণশীলতার বর্মে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। পাল যুগে সবধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমন্বয়ের পন্থা প্রচলিত ছিল— সেন যুগে তা ছিল না। সেন রাজত্বের শেষ দিক বাংলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠযুগ হিসেবে চিহ্নিত। লক্ষ্মণ সেনের পরবর্তী সময়ে তাঁর তিন পুত্র মাধব সেন, কেশব সেন, বিশ্বরূপ সেন ক্রমান্বয়ে গৌড়ের সিংহাসনে রাজত্ব করেন। [৫]

মহম্মদ ঘোরী দিল্লী অধিকার করে কুতবুদ্দিনকে প্রতিনিধি করে গজনীতে ফিরে যান। আনুমানিক ১১৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কুতুবুদ্দিনের সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখ্‌তিয়ার খলজি/ খিলজি গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী অধিকার করেন। গিয়াসুদ্দদ্দিন ইউয়জের পর লখনৌতি পূর্ণরূপে দিল্লীর সুলতানী শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। বহু শাসকের উত্থান-পতনের পর লখনৌতিতে (লক্ষ্মণাবতী) বলবনী বংশের শাসন চলে আনুমানিক ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ অবধি।

পরবর্তী পর্বে তুঘলক বংশের শামস-উদ-দীন ফিরুজ শাহ (১৩০৯-১৩২২ খ্রিঃ) লখনৌতির সুলতান হন। দিল্লীতে তখন শাসক গিয়াস-উদ-দীন তুঘলক। এর কিছুকাল পর আলা-উদ-দীন আলি শাহ (১৩৪০-১৩৫৩ খ্রিঃ) লখনৌতি অধিকার করেন এবং রাজধানী লখনৌতি থেকে পান্ডুয়ায় স্থানান্তরিত হয়। এরপরে লখনৌতি অধিকার করেন শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ। ইলিয়াস শাহের পর তাঁর পুত্র শিকান্দর বাংলায় দীর্ঘকাল (১৩৫৯-১৩৯০ খ্রিঃ) রাজত্ব করেন। মালদহের বিখ্যাত আদিনা মসজিদ তাঁরই নির্মিত।

বাংলার পাঁচ শতাধিক বছরের মুসলমান শাসনে ভাতুরিয়া পরগণার (বর্তমান রাজশাহী) জমিদার রাজা গনেশ (১৪০৫-১৪১৪) স্মরণীয় নাম। রাজা গনেশ মুসলমানদের (বর্তমান রাজশাহী) ইতিহাসে কংস নামে পরিচিত। গৌড়ের 'ফতে খানের সমাধিভবন' নামে একটি চোতালা গৃহ এবং পান্ডুয়ার 'একলাখি ভবন' তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি। তাছাড়া আদিনা মসজিদ সংস্কার সাধন করে সেটিকে 'কাছারীগৃহ' হিসাবে পরিণত করাও তাঁর স্বল্পদৈর্ঘ্যের রাজত্বকালের চিহ্ন বলে প্রবাদ। গণেশের পুত্র যদু (ধর্মান্তরিত হয়ে জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ ১৪১৪-১৪৩০), বা জাঠমল গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। পিতা গনেশ কর্তৃক ধ্বংস মসজিদগুলি সংস্কার করেন তিনি। যদু বলপূর্বক বহু হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করেন— তাঁর আমলে এইভাবে মুসলমানের সংখ্যা বেড়েছিল পূর্ববঙ্গে। পান্ডুয়ার অট্টালিকা ও গৌড়ের বহু পুকুর জালালি নামে পরিচিত। জালালউদদীন পুত্র শামস-উদ-দীনের মৃতুর সঙ্গে সঙ্গেই গনেশের বংশের রাজত্বের সমাপ্তি ঘটে।

গনেশের বংশের পর গৌড়ে ইলিয়াস শাহী বংশ পুনরায় রাজত্ব করে। নাসির উদদীন মাহমুদ শাহ (১৪৪২-১৪৬০) এবং তাঁর পরে তাঁর পুত্র রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। বিখ্যাত দাখিল দরওয়াজার (১৪৬০-১৪৭৪), বাইশগজি প্রাচীরের স্রষ্টা তিনি। এর কিছুকাল পরে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করে হাবশি খোজারা। মালিক আন্দিল ওরফে সুলতান সয়ফ-উদ-দীন ফিরুজ শাহ (১৪৮৭-১৪৯০) গৌড়ে ফিরোজমিনার, একটি মসজিদ ও জলাশয় নির্মাণ করেন। ছয় বছরের হাবশী-কুশাসন লুণ্ঠন, অত্যাচার, লাম্পট্য, ভ্রষ্টাচার, ষড়যন্ত্র ও অহেতুক রক্তপাতের দ্বারা লাঞ্ছিত। এরপর হুসেনশাহী শাসনের সূত্রপাত (১৪৯৪-১৫২৫)— এই সময়ে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় এবং রাজ্যের পরিচিতি বাড়ে। যশোরাজ খান, দামোদর,

কবিরঞ্জন প্রমুখ বাঙালী কবি হোসেন শাহের কর্মচারী ছিলেন। হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করে রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। এছাড়া পরাগল খাঁ, ছুটী খাঁ, সনাতন, রূপ, বল্লভ প্রমুখের প্রসঙ্গও স্মরণীয়। হুসেন শাহের সভাকবি - ছিলেন শ্রীকর নন্দী। সনাতন ও রূপ-দবির খাস ও সাকর মল্লিক (বৈষ্ণব ষড় গোস্বামীর অন্যতম) হুসেনশাহি রাজত্বের দুই স্তম্ভ ছিলেন। এঁর রাজত্বকালে ১৫১৫ খ্রি: জুন মাসে গৌড়ের রামকেলীতে শ্রীচৈতন্যদেব পদার্পণ করেন।

মালদহ জেলার সদর মহকুমার ইংরেজবাজার থানা থেকে ১৬ কি.মি. দক্ষিণে গৌড়ের (রাজধানী) নিকট বৈষ্ণব তীর্থ রামকেলি ধাম অবস্থিত। শ্রীচৈতন্য রামকেলিতে এলেন — ১. রূপ, সনাতনের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎ ও আলোচনার জন্য, ২. চৈতন্যদেব তাঁর ভক্তি আন্দোলনের ধারাকে যে সব কেন্দ্র থেকে পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন তার মধ্যে গৌড় অন্যতম, ৩. নীলাচল ত্যাগ করে গৌড় হয়ে বৃন্দাবন যাবার বাসনা প্রকাশ করেন শ্রীচৈতন্য। 'বৈষ্ণবকরণ' অনুষ্ঠান, 'কণ্ঠীবদল' অনুষ্ঠান, মাতৃপিণ্ডদানের প্রথা রামকেলিতে প্রচলিত।' নবদ্বীপের মতো রামকেলিও ছিল তৎকালীন বাংলার হিন্দু অধ্যুষিত এবং সংস্কৃত বৈষ্ণবদর্শন চর্চার অন্যতম একটি পীঠস্থান।

মালদহে মহানন্দা নদীর পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত মাধাইপুর গ্রামের কুমারদেব গোস্বামী ও রেবতীর সন্তান অমর (প্রধানমন্ত্রী/দবীর খাস) সন্তোষ (খাস মুন্সী/ সাকর মল্লিক) রামকেলিতে প্রতিষ্ঠিত হন। হুসেন শাহের এই দুই জন হিন্দু রাজকর্মচারী ছিলেন হুসেন শাহের দুই শক্তিস্তম্ভ। এঁদের নিজপক্ষে টেনে আনার উদ্দেশ্য এবং এঁদের দ্বারা গৌড়ীয় আদর্শের প্রকাশবাহী কাব্য-দর্শন-রসশাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা দিতে বদ্ধপরিকর শ্রীচৈতন্য রামকেলি এসেছিলেন। হুসেনশাহী রাজত্বে ভক্ত সমাগমের মধ্যে দিয়ে রাজরোষ উপেক্ষা করে সফল হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য। পরবর্তীতে বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর অন্যতম (রূপ, সনাতন এবং তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব) বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন (বৃহদ্ভাগবতামৃত, উজ্জ্বলনীলমনি যার অন্যতম)।

রূপ ও সনাতনের উদ্যোগে রামকেলি গ্রামে মদনমোহন মন্দির, শ্যামকুন্ড, রাধাকুন্ড, অষ্টসখী কুন্ড, কদম্বকানন সম্বলিত গুপ্তবৃন্দাবন নির্মিত হয়েছিল। বর্তমান সময়েও প্রতি বছর দূর দূরান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্তপ্রাণ বৈষ্ণব বৈষ্ণবী এবং নিমাই প্রেমে মাতোয়ারা কীর্তনীয়ার দল জৈষ্ঠ্য সংক্রান্তিতে রামকেলি এসে ভিড় জমায়। রূপ-সনাতনের মাতুলালয় মাধাইপুর গ্রাম (পুরাতন মালদহ) মালদহের মানচিত্রে অবহেলিত থাকলেও রামকেলি স্বমর্যাদায় অধিষ্ঠিত। পৌন্ড্রবর্ধন ভুক্তি, পাল এবং সেন রাজত্বকালেই শুধু উল্লেখযোগ্য নয়— বাংলায় ইসলাম ধর্মের শাসনকালেও (হুসেনশাহী আমলে) গৌড় (রামকেলিতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার প্রসারের কারণে) মালদহের ইতিহাসকে মহিমান্বিত করেছে।[৬]

হুসেন শাহের পরে তাঁর পুত্র নসরত শাহ গৌড়ের সিংহাসনে বসেন, ইনি গৌড়ে বারদুয়ারী মসজিদ, কদম রসুলের ভবন নির্মাণ করেন। এর কিছুকাল পর হুমায়ুন গৌড় অধিকার করেন (১৫৩৮) তাঁর পরে আফগান বীর শের খাঁ বাংলার অধিপতি হন। এসময় বাংলা দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্যতম একটি প্রদেশে পরিণত হয়। আফগান রাজত্বের শেষে ১৫৭৫ এ গৌড় পরিত্যক্ত হয় এবং মহামারীতে বহু লোকের মৃত্যু হয়। দাউদ কররাণীর মৃত্যুর (১৫৭৬) মধ্যে দিয়ে বাংলায় আফগান শাসনের সমাপ্তি ঘটে। [৭]

মুঘল রাজত্বে বাংলা

মুঘল রাজত্বের শুরুতে কিছুকাল বাংলায় সুশাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দ বাংলার শাসনকর্তা হন মানসিংহ। তারপর কুতুবুদ্দীন খান কোকাকে জাহাঙ্গির বাংলার শাসক করেন— এর হাতে বর্ধমানের জায়গিরদার শের আফগান ইস্তলজুর সংঘর্ষ ও মৃত্যু ঘটে। শের আফগান এর বিধবা পত্নী পরে নূরজাহান নামে খ্যাত হন। সাজাহান থেকে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু (১৭০৭) পর্যন্ত বাংলায় মোঘল শাসন সামগ্রিকভাবে শান্তি-শৃঙ্খলায় কাটে। ঔরঙ্গজেব নিযুক্ত শাসক মীর জুমলার মৃত্যুর পর বাংলায় নৈরাজ্য দেখা যায়। ১৬৬৪ তে বাংলার সুবাদার হন শায়েস্তা খান-এঁর নিজস্ব জায়গীর ছিল মালদহে। ইংরেজরা বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি পায় শাহ সুজার সময়ে (১৬৫০)। প্রথমে হুগলীতে এবং পরবর্তী সময়ে ঢাকা, রাজমহল ও মালদহে (১৬৮০) তাদের কুঠি স্থাপিত হয়।

মুর্শিদকুলী খান ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার নবাব হন। এঁর জামাতা সুজা-উদ-দীন এর মৃত্যুর পর (১৭৩৯) সুজা-উদ-দীন পুত্র সরফরাজ খান নবাব হন। আলিবর্দী খান গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজকে পরাজিত ও নিহত করে মুর্শিদাবাদ অধিকার করেন। আলিবর্দীর পর তাঁর দৌহিত্র সিরাজ-উদ-দৌলা নবাব হন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে রবার্ট ক্লাইভের কাছে পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হন এবং মালদহে বন্দী হন এবং সিরাজ মীরণের হাতে নিহত হন। এরপর নবাবী শাসনের শেষ এবং ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাত ঘটে। [৮]

আধুনিক যুগ

আর্মেনিয়ান, ডাচ, পোর্তুগীজ, ফরাসী বণিকেরা মধ্য ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দে মালদহে ব্যবসা বাণিজ্য করত। ঐ একই উদ্দেশ্যে পরে এখানে ব্রিটিশদের আগমন। ১৭৮০ খিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক অধ্যক্ষ চার্লস গ্র্যান্টের সময় থেকে মালদহে ইংরেজদের বাণিজ্যিক কার্যকলাপের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। মহানন্দা কালিন্দ্রীর সংগমস্থলে প্রাচীন বাণিজ্য নগরী মালদহকে ছেড়ে—

মহানন্দার পশ্চিম পাড়ে ইংরেজরা নতুন করে ঔপনিবেশিক শহর নির্মাণ করেন — সেটিই বর্তমান ইংরেজবাজার। ১৭৭০ খ্রি: বাণিজ্যিক প্রধানের ভবন নির্মিত হয় (যা আজকের কোর্টের প্রাচীন ভবন রেসিডেন্স টমাস হেন্সম্যানের তত্থাবধানে)। জেলা রূপে মালদহ তখনও আত্মপ্রকাশ করেনি। দিনাজপুর, রাজশাহী ও পুর্ণিয়া জেলার দ্বারা এই অঞ্চলটি নিয়ন্ত্রিত ছিল। দিনাজপুর জেলার— মালদহ ও বামনগোলা থানা, রাজশাহীর জেলা— রোহনপুর ও চাঁপাই, পুর্ণিয় জেলার— শিবগঞ্জ, কালিয়াচক, ভোলাহাট, গরগরিবা (বর্তমানে রতুয়া) এই থানা এলাকাগুলিতে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল। প্রশাসনিক ভবন থেকে দূরবর্তী হবার ফলে এসব অঞ্চলে সুষ্ঠ ভাবে প্রশাসনিক কাজ চালানো যাচ্ছিল না বলে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তদানিন্তন লোয়ার প্রভিন্সের সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৮১৩ খ্রি: মার্চ মাসে সরকার পৃথক একটি জেলা ঘোষণা করেন উক্ত থানাগুলি নিয়ে। শুরুতে মালদহ জেলাকে ভাগলপুর প্রশাসনিক বিভাগের অধীনে স্থাপন করা হয়, পূর্ণাঙ্গ জেলা রূপে মালদহ আত্মপ্রকাশ করে ১৮৫৯ খ্রী:। এর মধ্যে ১৮৩২ এ স্থাপিত হয় মালদহে ট্রেজারি । মালদহ জেলার সীমানা রূপে চিহ্নিত করা হয় পশ্চিমে গঙ্গাকে— উত্তর-পূর্বে মহানন্দাকে। ১৮৭৫ সালে আরও কিছু এলাকা (মুর্শিদাবাদ ও দিনাজপুরের) যুক্ত হয় মালদহ জেলার সঙ্গে। খরবা ও হরিশ্চন্দ্রপুর থানা যুক্ত হয় মালদহের সঙ্গে ১৮৯৬ সালে। ১৯০৫ সালে মালদহ ভাগলপুর বিভাগ থেকে রাজশাহী বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হয়। বঙ্গভঙ্গের কালে১৯০৫ থেকে ১৯১১ পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হল মালদহ সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কারণে। ১৮৭২ সালে মালদহ জেলায় থানার সংখ্যা ছিল ৯টি। ১৯২১ সালে জনগণনার পর মালদহে থানার সংখ্যা এসে দাঁড়াল ১৫টি। স্বাধীনতা পূর্ববতী সময়ে মালদহের বিহারভূক্তির দাবি প্রাধান্য না পেলেও স্বাধীনতার সূর্যোদয় কালে জেলাটির ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। হিন্দু সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বাংলার হিন্দু প্রধান এলাকাগুলোকে পশ্চিমবঙ্গের আওতায় রাখতে তৎপর হন। যদুনাথ সরকার মালদহ এবং রাজশাহীকে পশ্চিমবঙ্গে রাখার আবেদন জানান সীমানা নির্দ্ধারক কমিশনকে। কিন্তু ৩ রা জুন মুসলিম প্রধান জেলা হিসেবে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারত বিভাগ পরিকল্পনায় মালদহকে পাকিস্তানের ভাগে রাখলেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের এই প্রস্তাবের সমর্থনে ১৪ ই আগস্ট মালদহের পাকিস্তানী পতাকা ওড়ে। হিন্দু মহাসভার পক্ষে (আইনজীবী শিবেন্দু শেখর রায়, যদুনাথ সরকার প্রমুখ) মালদহের ভারতভূক্তির পক্ষে জোরালো আবেদন রাখা হয়। ১৭ ই আগস্ট র‍্যাডক্লিফ কমিশনের ঘোষণায় বলা হল অখন্ড মালদহ জেলার শিবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, ভোলাহাট, নাচোল এবং গোমস্তাপুর এই পাঁচ থানা পূর্বপাকিস্তানের এবং অন্য দশটি থানা ভারতের ভাগে পড়ল। ১৮ই আগস্ট মালদহ জেলার শাসনভার মঙ্গলকুমার আচার্যের হাতে এলে পাকিস্তানী পতাকা নামিয়ে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হল। দেশ ভাগের আগে জেলার আয়তন ছিল ১৮৯৯ বর্গ মাইল। ১৯৪৭ এ খণ্ডিত মালদহ জেলার আয়তন হল ১৩৯৯.৯ বর্গমাইল। গঙ্গা, মহানন্দা, ফুলহারের ভাঙ্গন মালদহের আয়তনে থাবা বসাল। বর্তমানে মালদহ জেলার ১১ টি থানা, ১৫টি ব্লক, মহকুমা দুটি— সদর ও চাঁচল। জলপাইগুড়ি বিভাগের দক্ষিণতম জেলা।[৯]

খ. ভৌগোলিক পরিচয় — প্রাকৃতিক পরিচয় :

জন্মলগ্ন থেকে মালদহ জেলার ভৌগোলিক অবস্থান ক্রম পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের কারণ প্রধানত দুইটি— রাজনৈতিক কারণ, প্রাকৃতিক কারণ।

১৮১৩ সালে পৃথক জেলা রূপে মালদহের জন্ম হওয়ার পর জেলাটি কখনো ভাগলপুর, কখনো জলপাইগুড়ি বিভাগের অন্তর্ভূক্ত হয়। স্বাধীনতার সময় জেলাটির সীমানা নির্ধারণ নিয়ে পূর্ব-পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে টানাপোড়েন চলে মূলত হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেস মুসলিম লিগের তৎপরতায়। ১৭ ই আগস্ট ১৯৪৭ র‍্যাডক্লিফ কমিশনের ঘোষণায় বলা হল অখন্ড মালদহ জেলার শিবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, ভোলাহাট, নাচোল এবং গোমস্তাপুর এই পাঁচ থানা পাকিস্তানের এবং অপর দশটি থানা ভারতের ভাগে পড়ল। ১৮ ই আগস্ট মালদহ জেলায় ভারতের জাতীয় পতাকা উড়ল। দেশ ভাগের আগে অখন্ড মালদহ জেলার আয়তন ছিল ১৮৯৯ বর্গমাইল— থানা সংখ্যা ১৫টি (১৯২১ সালের জনগণনার পর থেকে) ১৯৪৭ এ খণ্ডিত মালদহ জেলার আয়তন হল ১৩৩৯.৯ বর্গমাইল।

স্বাধীনতার পূর্বে মালদহ জেলার থানাগুলি হল —১. মালদহ, ২. হবিবপুর, ৩. হরিশচন্দ্রপুর, ৪. খরবা, ৫. মানিকচক, ৬. রতুয়া, ৭. ইংরেজবাজার, ৮. ভোলা হাট, ৯. গাজোল, ১০. বামনগোলা, ১১. কালিয়াচক, ১২. নবাবগঞ্জ, ১৩. নাচোল, ১৪. শিবগঞ্জ ও ১৫. গোমস্তাপুর।

স্বাধীনতা পরবর্তী পর্বে মালদহ জেলার থানাগুলি হল— ১. মালদহ, ২. হবিবপুর, ৩. হরিশচন্দ্রপুর, ৪. খরবা, ৫. মানিকচক, ৬. রতুয়া, ৭. ইংরেজবাজার, ৮. গাজোল, ৯. বামনগোলা, ১০. কালিয়াচক।

বর্তমানে প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে থানা অপেক্ষা ব্লকগুলিই প্রাধান্য পায় এবং ব্লকের সংখ্যা ১৫টি— ১. মালদহ, ২. হবিবপুর, ৩. হরিশ্চন্দ্রপুর-১, ৪. হরিশ্চন্দ্রপুর-২, ৫. রতুয়া-১, ৬. রতুয়া-২, ৭. মানিকচক, ৮. ইংরেজবাজার, ৯. গাজোল, ১০. বামনগোলা, ১১. চাঁচল-১, ১২. চাঁচল-২, ১৩. কালিয়াচক-১, ১৪. কালিয়াচক -২, ১৫. কালিয়াচক-৩।

মালদহের সীমা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শুধু রাজনৈতিক কারণ নয় প্রাকৃতিক কারণ তথা নদীর গতিপথ পরিবর্তন বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সার্ভেয়ার কোলব্রুকের মতে গঙ্গা এক সময় গৌড় দুর্গের পশ্চিম দিয়ে প্রবাহিত হত। আবার তবকাত-ই নাসিরীতে আছে গৌড় (লখনৌতি) গঙ্গার পশ্চিম দিকে, এখন আবার বহু দূর সরে গেছে। গঙ্গার বার বার এই পথ পরিবর্তন, গঙ্গা, মহানন্দা, ফুলহরের ভাঙন মালদহের সীমানা পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এই পরিবর্তনের কারণ ফারাক্কা

ব্যারেজ, রাজমহল পাহাড় এবং ভূতনির চক্রবাঁধ (৬০ বর্গমাইল)। বিহার অধুনা ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মালদহের সীমানা নিয়ে সমস্যা অমিমাংসিতই রয়েছে।

মালদহ জেলা বর্তমানে এইসব রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক কারণে পরিবর্তিত হয়ে যে ভৌগোলিক অবস্থানে আছে— উত্তর গোলার্ধের ২৫.৩২′০৮″ (উত্তর) এবং ২৪.৪০′২০″ (দক্ষিণ) অক্ষাংশের মধ্যে এবং ৮৮.২৮′১০″ পূর্ব ও ৮৭.৪৫′১০″ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশের কর্কটক্রান্তির উত্তরে অবস্থিত ।

সীমানা :

গঙ্গা মালদহ জেলার পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রান্তের সীমানা। গঙ্গার অপর তীরে (পশ্চিমে) ঝাড়খণ্ড রাজ্য। উত্তর-পশ্চিমে বিহার রাজ্য, উত্তর ও উত্তর-পূর্বে উত্তর দিনাজপুর জেলা, পূর্বে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা, দক্ষিণপূর্বে বাংলাদেশ।

১) প্রাকৃতিক সূত্রে —

ভূ-প্রকৃতিগত দিক থেকে মালদহ জেলাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। i) বরিন্দ, ii) টাল, iii) দিয়ারা।

বরিন্দ :—

মহানন্দা নদী মালদহ জেলার উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে এই জেলাকে প্রায় দুভাগে বিভক্ত করেছে। পূর্বদিকের ভাগকে বরিন্দ বা বরেন্দ্রী অঞ্চল বলা হয়। বর্তমানে মালদহ, গাজোল, হবিবপুর, বামনগোলা এই চারটি থানা বরিন্দ অঞ্চলের অন্তর্গত। নবাবগঞ্জ (ওল্ড মালদহ), নাচোল, গোমস্তাপুর— অধুনা বাংলাদেশের এই অঞ্চলগুলি বরিন্দ অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল।

বরিন্দ এলাকার ভূ-প্রকৃতি বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ। উঁচু-নিচু টিলা সদৃশ এই বরিন্দ (বরেন্দ্র) এলাকা। এর সর্বাপেক্ষা উচ্চভূমি সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৩৭ মিটার উচ্চ। উচ্চতা অনুসারে এখানকার ভূমিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়— ডাঙ্গা, আর কাঁদর (কান্দর), কাঁদর। মাটি শক্ত ও প্রাচীন বালি মাটি দ্বারা গঠিত, পুরাতন পলি মাটি এবং লাল বা কুঁকুরে মাটি এবং পশ্চিমে আধুনিক পলিমাটি দেখা যায়। ভূগর্ভস্থ জলস্তর খুব নীচে, গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড জলাভাব, অসংখ্য প্রাচীন মজে যাওয়া পুকুর এই অঞ্চলে দেখা যায়। জলাভাবের কারণে এখানে জমিগুলি প্রায় এক ফসলি, চাষাবাদ অনেকটা বৃষ্টির জলের ওপর নির্ভরশীল। বরিন্দ অঞ্চলের প্রান্তিক এলাকার কোথাও কোথাও ঘন জঙ্গল থাকলেও অধিকাংশ অংশেই তাল, খেজুর, মহুয়া, বাবলা, বিভিন্ন প্রকার কাঁটা জাতীয় গাছ জন্মাতে দেখা যায়।

সংস্কৃতে বরিন্দ বা শ্রেষ্ঠ ভূমি অর্থাৎ প্রাচুর্যের দেশ, রাজশাহী অঞ্চলের বিভাষায় এই

বরেন্দ্র অর্থে টাকা রাখার তহবিল। আবার প্রাচীন অনার্য বাংলায় বরিন্দ অর্থে কৃষিযোগ্য জমি। বরিন্দ বা বরেন্দ্র এলাকার প্রাচীনত্ব ও সমৃদ্ধি ইতিহাস সমর্থিত। বর্তমানেও মাটির তলা থেকে বহু প্রত্ন নিদর্শন উদ্ধার হচ্ছে। একসময়ে রাজধানী গৌড় থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরের ফলে এই অঞ্চলের গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং বেশিরভাগ অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে। বিহার থেকে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষদের এনে এ অঞ্চলকে জঙ্গলমুক্ত করে চাষযোগ্য করা হয়।

২. টাল :

মহানন্দা নদীর পশ্চিম তীরের ভূখণ্ডে কালিন্দ্রী নদী পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রবাহিত হওয়ার ফলে দুটি ভাগের সৃষ্টি হয়েছে। এর উত্তর ভাগকে 'টাল' ও দক্ষিণ ভাগকে 'দিয়ারা' বলা হয়। টাল অঞ্চলের সীমানা হিসাবে বলা যায় রতুয়া-১, ২, চাঁচল-১, ২, হরিশ্চন্দ্রপুর-১, ২ এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

'টাল' অর্থে তির্যক বা ঢালু, এর আক্ষরিক অর্থে জলাভূমি অর্থৎ জলা বিলে পরিপূর্ণ। টালের ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হল অনেকগুলি প্রাচীন ও নবীন নদীর সহাবস্থান। মহানন্দা, কালিন্দ্রী, ফুলহার, ছাড়াও কালিকোশ, কোশ, কঙ্কর, বারোমাসিয়া কোশি, মরা মহানন্দা—এ অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত নদী। নদীগুলির বারবার গতি পরিবর্তনের ফলে প্রচুর জলাভূমি (বিল বা ঢাব) সৃষ্টি হয়েছে।

G.E. Lambourn তাঁর গ্রন্থে বলেছেন—

"West of the Mahananda the country is again divided into two well defined parts by the Kalindri river flowing west and east from the Ganges. North of the Kalindri the distinguishing natural feature is the *tal* land, the name applied to the land which floods deeply as the rivers rise, and drains by meandering streams into swamps or into the Kalindri. There are extensive tracts of this land covered, where not cultivate, with tall grass in Ratua and Tulsihata thanas." [১০]

এই অঞ্চল কৃষি প্রধান, আম, ধান, পাট এ অঞ্চলের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য।

৩. দিয়ারা (দিয়াড়া) :

কালিন্দ্রী নদীর দক্ষিণ দিকের অংশ 'দিয়ারা'। দিয়ারা গঙ্গার প্রাচীন প্লাবনভূমি। ইংরেজবাজার, মানিকচক, কালিয়াচক ১, ২, ৩ দিয়ারা অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। দিয়ারার পূর্ব-দক্ষিণভাগে গঙ্গার ভাঙন অর্থাৎ ক্রমশ পূর্ব দিকে এগিয়ে আসছে— যা মালদহ জেলার বিপজ্জনক সমস্যার অন্যতম। এই অঞ্চলের মাটি খুবই উর্বর, চাষাবাদের উপযুক্ত। এবং আমবাগান ও রেশম চাষ এর জন্য এ অঞ্চল বিখ্যাত। এই অঞ্চল ঘন জনবসতি পূর্ণ। দিয়ারার এই অঞ্চল ভূতনি দিয়ারার (দ্বীপ বা চর) কথাও এ প্রসঙ্গে আসে। এই দিয়ারা অঞ্চল সম্পর্কে G.E. Lambourn বলেছেন— " South of the Kalindri lies the most fertile and populous portion of the district. It is seamed througout by old

courses of Ganges, upon the banks of one of which the city of Gour once stood. The most striking natural feature is the continuous line of island and accretions formed in the bed of the Ganges by its ever changing currents and known as the *diara*." [১১]

২) জল-জলাশয়ের সূত্রে : ক) মালদহ জেলার নদ-নদী—

মালদহ জেলায় নদ-নদী এবং জলাভূমির পরিমাণ বেশি থাকায় 'লেক ডিস্ট্রিক অব্ বেঙ্গল' নামে মালদহ পরিচিত ছিল। হ্রদের অপভ্রংশ 'দহ'-এ থেকেও এই নামকে সমর্থন করা যেতে পারে। প্রচুর পরিমাণে খাল-বিল, খানা-খন্দ-বাস্তবে এবং নথিতে-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ছোট বড় পুকুর দিঘিও এই জেলায় কম নেই।

Water Resources :

i) Impounded Culturable water area	: 10773.57 ha
ii) River	: 6497.60 ha
iii) Canal & Khal	: 2511.42 ha
iv) Beel & Baors	: 4551.55 ha
v) Name of Main Rivers	: Ganga, Mahananda, Kalindri, Pagla,Fulahar, Punarbhaba, Bhagirathi, Mora Tangan. [১২]

মহানন্দা

দক্ষিণ পশ্চিম নেপালের হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে কার্সিয়াং ও শিলিগুড়ি অতিক্রম করে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মধ্যে দিয়ে মালদহ জেলায় প্রবাহিত হয়েছে এই নদী। মালদহ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলকে স্পর্শ করে বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে পদ্মায় পড়েছে। এই নদী বহু শাখা নদী-উপনদীর সঙ্গে যুক্ত।

মহানন্দা নদীর গতিপথ ২২৫ মাইল দীর্ঘ। মালদহে নদীটির বিস্তার ৫৫ মাইল (৮৮.৬ কি.মি)। অতীতে মালদহে নদীটির দৈর্ঘ্য ছিল ১০৮ মাইল।

উত্তর দিনাজপুরে নাগর নদীকে নিয়ে মহানন্দা মালদহে প্রবেশ করেছে। চাঁচলের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণের কালিন্দ্রীকে গ্রহণ করে জেলার প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আইহোর কাছে টাঙ্গনকে নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। গতিপথ খরবা (চাঁচল), রতুয়া, গাজল, ওল্ড মালদহ, ইংরেজবাজার থানাকে স্পর্শ করে বয়ে গেছে এই নদী। মালদহ জেলার বর্তমান ভৌগোলিক টাল, দিয়ারা, বরিন্দের সীমানা নির্ণায়ক নদী।

বর্তমানে মহানন্দা মালদহ জেলার প্রধান নদী হলেও তার অতীতের গৌরব ম্লান হয়েছে। এই নদীকে কেন্দ্র করে যে ঐতিহ্যবাহী জলপথে বাণিজ্য চলত তা আজ শুধুই অতীত। বহু শাখানদী,

উপনদী সমৃদ্ধ হওয়ার ফলে মহানন্দায় মৎস্যসম্পদের যে প্রাচুর্য ছিল তাও আজ ম্লান। নদীর বুকে চর পড়ে চাষের জমি, জনবসতি গড়ে উঠেছে। অতীতে যে অভিবাসিত মৎস্যজীবীরা মহানন্দার ধারে সুখে বাস করত এখন নদী মজে যাওয়ায় তাদেরও দুর্দিন। [১৩]

গঙ্গা

পবিত্র নদী 'গঙ্গা' মালদহ জেলাকে স্পর্শ করেছে এবং নানা দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করেছে। মালদহ জেলার বহু ইতিহাস গঙ্গা নদীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। রাজমহল পাহাড় পেরিয়ে গঙ্গা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে মাঝে একটি চরের সৃষ্টি করেছে (ভুতনির চর)। বর্তমানে বহু মানুষ সেখানে বসবাস করে। ফরাক্কা ব্যারেজ তৈরি হওয়ার পর এই চরের সৃষ্টি হয়। নদী বেষ্টিত এই ভুতনির চর খুবই উর্বর। গঙ্গার সঙ্গে মালদহের অন্যান্য বহু নদীর সংযোগ সৃষ্টি হয় বর্ষার সময়— বন্যার সময়; ফলে বহু প্রকার মাছের হদিস পাওয়া যায় এখানে। জেলা গেজেটিয়ার মতে এ জেলায় এই গঙ্গা নদীর বর্তমান দৈর্ঘ্য সীমা ৭২ কিমি। কালিন্দ্রী, পাগলা, ভাগীরথী (ছোটো ভাগীরথী) তিনটি মজা শাখানদী গঙ্গার অতীত গতিপথকে স্মরণ করায়।

গঙ্গার বর্তমান গতিবিধি অনুসারে বলা যায় অদূর ভবিষ্যতে নদীর গতিপথ বদল হবে এবং নদী মিশে যেতে পারে কালিন্দ্রীর সাথে— মালদহের মানচিত্রেও ঘটবে পরিবর্তন, গঙ্গা প্রতিমুহূর্তে বহু মানুষের ঠিকানা বদল ঘটাচ্ছে, গঙ্গা পাড়ে বসবাসকারী মৎস্যজীবী মালোদেরও ঠিকানা বদল ঘটেছে এভাবেই।

কালিন্দ্রী

কথিত আছে ত্রয়োদশ শতকে কালিন্দ্রী ছিল গঙ্গার মূল স্রোত। অতীতে বাংলার রাজধানী গৌড়ের অবস্থান ছিল কালিন্দ্রী ও ছোট ভাগীরথীর মাঝের প্লাবনভূমিতে। কালিন্দ্রীর প্রবাহ পথে 'টাল' অঞ্চল থেকে বারোমাসিয়া, কোশ, কঙ্কর, কালকোশ নামে চারটি শাখা নদী এসে মিশত, বর্ষাকালীন জল নিকাশিতে এসে মিশত। বর্তমানে এই নদীগুলি মৃত প্রায়। পুর্নিয়ার ফুলহার হয়ে হরিশ্চন্দ্রপুরের মিঞাহাটে মালদহে প্রবেশ করেছে কালিন্দ্রী। মাহানন্দার এই শাখা রতুয়ায় আচমকা দক্ষিণে বাঁক নিয়ে মহানন্দার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিমাসরাই ঘাটের কাছে। ইংরেজবাজারের কাছে কালিন্দ্রীর একটি মরা খাত লক্ষ করা যায়। কালিন্দ্রীর ধারে বসবাসকারী মালো সম্প্রদায় সাধারণ এদেশীয় মালো এবং গৌড়ীয় মালো বা গুড়ি মালো নামে এরা পরিচিত।

ফুলহার

মহানন্দার এই শাখানদী বিহারের পুর্নিয়া দিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুরের মিঞাহাট পর্যন্ত প্রবাহিত। এরপর নাম কালিন্দ্রী। মালদহে এই নদীপথের দৈর্ঘ্য ১০০ কি.মি. বা ৭০ মাইলের বেশি। একই নদী ফুলহার—কালিন্দ্রী রূপেও পরিচিত, ফুলহার নদীর অনেক উপনদী আছে।

ভাগীরথী

এই ভাগীরথী নদী দঃবঙ্গের ভাগীরথী নয়, এটি ছোট ভাগীরথী বা মালদহের ভাগীরথী নামে কথিত। ভুতনি দিয়ারা থেকে গঙ্গার একটি ধারা পঞ্চানন্দপুর, সাদুল্লাপুর, বাংলার প্রাচীন রাজধানী 'গৌড়' হয়ে মহদিপুরের পাশ দিয়ে বাংলাদেশে মহানন্দায় মিলিত হয়েছে।

তুলশী গঙ্গা

মালদহ জেলার ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত সাদুল্লাপুর এলাকার বড় সাগরদীঘির দক্ষিণে তথা মোথাবাড়ি থেকে সাদুল্লাপুর হয়ে বাধা পুকুরগামী পাকা সড়কটির সংশ্লিষ্ট নয়নজুলির সংলগ্ন পাশ্ববর্তী অংশে নদীটির মজে যাওয়া খাত বিদ্যমান। এই নদীটি ছোট ভাগীরথীতে গিয়ে মিশেছে।

পাগলা

এটি গঙ্গার শাখা নদী। পঞ্চানন্দপুরে ভাগীরথী থেকে বেরিয়ে বাঙ্গীটোলা ও মোথাবাড়ির পাশ দিয়ে প্রবাহিত একটি ধারা 'পাগলা' নামে কালিয়াচকে প্রবেশ করেছে। ফরাক্কার চরবারপুর এলাকায় গঙ্গা থেকে জাত একটি ধারা 'পাগলা' নামেই পরিচিত ও প্রথম পাগলা'র সাথে মিলে মহদিপুরে ভাগীরথীর সঙ্গে মিশেছে। পরে এটি খালের রূপ নিয়ে বাংলাদেশে কানসাটের কাছে মহানন্দার সাথে যুক্ত হয়েছে।

বেহুলা

বেহুলা মূলতঃ মহানন্দার একটি শাখা নদী, মনসামঙ্গলের কালে এই নদীটি মহানন্দা নদী থেকে উৎপন্ন হয়ে পুরাতন মালদহের নানা অংশ ছুঁয়ে যাত্রাডাঙ্গা হয়ে প্রবহমান ছিল। পুরাতন মালদহের দক্ষিণে অবস্থিত জলঙ্গা গ্রামটির সংলগ্ন নদী খাতটি লোকমুখে 'জলঙ্গী' নদী নামে পরিচিত, জলঙ্গীর সঙ্গে নদীটি মিশেছে।

পুনর্ভবা

পুনর্ভবা তিস্তার বা ত্রিস্রোতার অন্যতম স্রোতধারা। করতোয়া নদী থেকে পুনর্ভবার উৎপত্তি। দক্ষিণ দিনাজপুরের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মালদহ জেলার পূর্ব সীমানা বামনগোলা ও হবিবপুর থানার পূর্ব প্রান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে মহানন্দায় মিশে পদ্মায় পড়েছে। মালদহে মোট দৈর্ঘ্য ৬৪.৪ কি.মি.। নদীটি বহু প্রাচীন ও খরস্রোতা। মালদহের বহু ইতিহাস জড়িত এই নদীর সঙ্গে।

টাঙ্গন

জলপাইগুড়ি জেলায় উৎপন্ন হয়ে বাংলাদেশ ও দিনাজপুর এবং ভারতীয় দিনাজপুর হয়ে মালদহ জেলায় প্রবেশ করেছে। গাজোল ও বামনগোলা থানার সংযোগস্থলে দুই থানার সীমানা নির্ধারণ করে আইহোর কাছে মহানন্দায় মিশেছে।

ব্রাহ্মণী

এই নদীর উৎপত্তিস্থল — পুনর্ভবা। এ নদী টাঙ্গনের উপনদী। ব্রাহ্মণী নদীটি পশ্চিম দিনাজপুর, বর্তমান উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নানান সংশ্লিষ্ট অঞ্চল ছুঁয়ে মালদহ জেলায় প্রবেশ করেছে। মালদহ জেলার বামনগোলা থানার পূর্বসীমানা নালাগোলাকে স্পর্শ করে টাঙ্গন নদীতে মিলিত হয়েছে।

আইসেনি

এই নদীটির উল্লেখ তেমনভাবে পাওয়া যায় না মালদহের মানচিত্রে। বামনগোলা থানার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা বটতলী ঘাটের কাছে পুনর্ভবা নদী থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রায় ১৫.কি.মি. বামনগোলা থানার ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পান্নাপুর বর্ডারের (পার্বতীডাঙ্গা) কাছে বাঁক নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে পুনরায় পুনর্ভবায় মিলিত হয়েছে। এই নদী মরা পুনর্ভবা বা আইসেনি নামে পরিচিত।

নদী শুধু সভ্যতার ধারক বা বাহকই নয়— নদীর অবলুপ্তিতে সভ্যতা সংস্কৃতির অবলুপ্তিও ঘটে। নদী অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রাকৃতিক শোভা, ঐতিহ্য, পরিবেশ রক্ষাকারী, নৌ-বাণিজ্য, প্রাকৃতিক সম্পদেরও ধাত্রী। দিনে দিনে যেভাবে নদী বিলুপ্তির দিকে এগোচ্ছে তা সভ্য সমাজের মানুষকে একদিন নাড়া দেবেই।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের গর্বের দিন অবসান হতে বসেছে, নদী এবং জলাভূমি মজে গেছে। মালদহের নদী-জলাশয়গুলির নিয়তিও সুখকর নয়। নদীতে আজ মাছের অপ্রতুলতা, মৎস্য নির্ভর জনজাতির অবস্থাও শুকিয়ে যাওয়া নদী জলাশয়ের মতোই। মৎস্য নির্ভর জনজাতির অন্যতম মালো সম্প্রদায় যারা (জলজীবী) তারা আজ পেশা হারিয়ে ভাসমান। [১৪]

খ) মালদহ জেলার জলাশয়—

জলাশয় এক ধরনের আর্দ্রভূমি। সাধারণত স্থলজ ও জলজ বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গমস্থল। ১৯৭১ সালের পূর্বে জলাভূমিকে গুরুত্বহীন, বর্জিত স্থান বলে ভাবা হত। কিন্তু ১৯৭১ সালে ইরানে 'রামসার' শহরে ১৯১ টি দেশ নিয়ে অনুষ্ঠিত একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জলাভূমির গুরুত্ব ও সংরক্ষণ সম্পর্কে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এই জলাভূমিগুলি ভূ-ভাগের উপরিভাগের জলকে পরিশ্রুত করে ভূ-গর্ভস্থ জলের গুরুত্বপূর্ণ ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ রাখে।

জলাশয়ের সংখ্যা ও এলাকা অনুসারে ভারতবর্ষের রাজ্যগুলির মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ প্রথমস্থানে, পশ্চিমবঙ্গ চতুর্থে। পশ্চিমবঙ্গের সাব-হিমালয়ান জলাভূমি অংশের অন্তর্ভুক্ত মালদহ জেলার কিছু জলাভূমি। গাঙ্গেয় জলাভূমির অন্তর্ভুক্ত মালদহের দিয়ারা অঞ্চল, মিষ্টি জলের জলাভূমি মালদহ জেলায় সব থেকে বেশি। পশ্চিমবঙ্গে মিষ্টি জলের জলাভূমির প্রায় এক চতুর্থাংশেরও বেশি মালদহ জেলায় অবস্থিত। জেলার নদীগুলি দীর্ঘদিন ধরে গতিপরিবর্তনের ফলে পরিত্যক্ত নদীখাতগুলিই ছোট বড় জলাভূমির রূপ নেয়। মালদহ জেলার ভাষায় এগুলি 'খাল-বিল'।

মালদহ জেলায় অবস্থিত মোট জলাভূমির পরিমাণ ২৯৩৩৪.১৪ হেক্টর। জেলায় মোটভূমির প্রায় ৭.৮৮ শতাংশ -এর কাছাকাছি। মালদহ জেলার অধিকাংশ জলাভূমিই প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্ট। কিছু জলাভূমি মনুষ্যসৃষ্ট, এই অঞ্চলের প্রধান প্রধান জলাভূমিগুলি প্রধানত মহানন্দা, কালিন্দ্রী, পুনর্ভবা, ফুলহার এবং টাঙ্গননদীর দুই তির বরাবর অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে নথীভুক্ত ২৩টি বৃহৎ জলাভূমির মধ্যে ১১টি মালদহে অবস্থিত। এছাড়া ১০০ হেক্টরের কাছাকাছি মাপের ১৭টি, ১০ হেক্টরের মত মাপের ৩৫৬ টি, ১০-২৫ হেক্টর মাপের ১১৫টি এবং ২৫-১০০ হেক্টর মাপের ৭৪ টি জলাশয় বর্তমান।

আকৃতি, প্রকৃতি এবং নির্মিতির চরিত্র ভেদে মালদহ জেলার জলাশয়গুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—

১. মনুষ্য খনিত,

২. প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট — বিল, ঝিল, জোলা, ঢাব দিঘি, পুকুর, কুন্ড, ডোবা, ঢামালিয়া বিল, খাঁড়ি বিল ইত্যাদি।

মালদহের ভূপ্রকৃতি অনুসারে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে জলাভূমি গুলিকেও।

টাল অঞ্চলের জলভূমি: মহানন্দার দক্ষিণপ্রান্ত থেকে কালিন্দ্রী পর্যন্ত বিস্তৃত, এ অঞ্চলে জেলার সব থেকে বেশি জলাভূমি লক্ষ করা যায়। এগুলিতে বছরের বেশিরভাগ সময়ে জল থাকে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

ক. আধসই বিল—হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের পাচলা মৌজার প্রায় ১৪০ হেক্টর এলাকায় বিস্তৃত এই বিল।

খ. আধিগৌড় ঢাব বিল— হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের উত্তর হরিশ্চন্দ্রপুর মৌজায় এই বিল অবস্থিত। এখানেই রয়েছে আরও কয়েকটি বিল—ঢামালিয়া বিল, খাঁড়ি বিল ইত্যাদি।

গ. হাজার টাকিয়া বিল— হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের পিরোজপুর ও দঃ রামনগর মৌজার অনেকগুলি ছোট ছোট জলাভূমি আছে। এর মধ্যে হাজার টাকিয়া বিল, গাড়িয়া বিল ইত্যাদি।

ঘ. কনার বিল— এটি চাঁচল ব্লকে অবস্থিত। অনেকগুলি ছোট ছোট জলাভূমির সৃষ্টি এই বিল।

ঙ. বারবিল্লা বিল— এটি রতুয়া ২ নং ব্লকে অবস্থিত। এছাড়াও এখানে রয়েছে নয়াকোল, চুনাখালি বিল।

চ. বোয়ালিয়া বিল— এটি চাঁচল ২ নং ব্লকের বৃহত্তম জলাভূমি, অনেকগুলি ছোট বিলের সমষ্টি।

ছ. গোল্ড বোল্ড বিল— এটি হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকে অবস্থিত। এছাড়াও হরিশ্চন্দ্রপুরে বহু বিল রয়েছে যেমন— সনক বিল, খাসিমারি বিল, পাওবনা বিল, কোয়া বিল, সিংসার বিল, সোনাইগুরি বিল ইত্যাদি।

বরেন্দ্র বা বরিন্দ অঞ্চলের জলাভূমি : বরিন্দ অঞ্চলের জলাভূমির সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম এবং এগুলিতে জলও থাকে কম। এই অঞ্চলে টাঙ্গন ও পুনর্ভবা নদীর দুই ধারে জলাভূমিগুলির অবস্থান। পুনর্ভবা নদীর একপাশের বিলগুলি ভারতে-অপর পারের বিলগুলি বাংলাদেশে অবস্থিত।

ক. বরেন্দ্র অঞ্চলের সব থেকে বড় বিল বলাতুলি বিল। এই বিল ওল্ড মালদহ ব্লকের বৃহত্তম বিল, টাঙ্গন নদীর দক্ষিণে অবস্থিত। এছাড়া কালুয়ারি বিল, কোয়ার বিল ইত্যাদি অবস্থিত।

খ. ওল্ড মালদহ ব্লকের বলাতুলি বিল সংলগ্ন আরেকটি বড় বিল হল— মাধাইপুর বিল। এছাড়াও রয়েছে পুতুল বিল, বিথান বিল ইত্যাদি।

গ. নয়াবাঁধ বিল : হবিবপুর ব্লকের টাঙ্গন ও পুনর্ভবা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত এই বিলটি। এছাড়াও এ অঞ্চলে রয়েছে, বাকলা বিল, পাদুয়াবাদ বিল, বড় বিকান, ছোট বিকান বিল ইত্যাদি। এই অঞ্চলেই রয়েছে প্রাকৃতিক হিজল বিল— যা পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম হিজল বন এবং সম্ভবত ভারতবর্ষেও এটি বৃহত্তম হিজল বন। মালদহ জেলার গাজল, বামনগোলা, ওল্ড মালদহ এবং হবিবপুর ব্লকের প্রচুর ছোট ছোট বিল রয়েছে।

দিয়ারা অঞ্চলের জলাভূমি : এ অঞ্চলে জলাভূমিগুলিতে সারা বছরই প্রায় জল থাকে, জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈচিত্র্য ও লক্ষ করা যায়। এ অঞ্চলে চারটি বড় বড় জলাভূমি আছে—

ক. গাবগাছি-চাতরাল বিল : এইটি মালদহ জেলার সর্ববৃহৎ জলাভূমি। প্রায় ২৪ বর্গ কিমি এলাকায় এটি বিস্তৃত। ইংরেজবাজার ব্লকে অনেকগুলি বিল একসাথে এই বিলটি গঠন করেছে— গাবগাছি ১ নং বিল, গাবগাছি ২ নং বিল, সোনাতলা বিল, অভিরামপুর বিল, ভিওয়া বিল, রুইমারি বিল, বাহাগালা, চিড়াকেল্টি বিল ইত্যাদি বিল নিয়ে গঠিত। শহরের আবর্জনা বিলটিকে মজিয়ে দিচ্ছে, শহরের নর্দমার জল বিলটির জল দূষিত করে তুলছে, বিলটি যথেচ্ছ ভাবে বুঁজিয়ে শহর বেড়ে চলেছে (লেক গার্ডেন, মালঞ্চপল্লী, নেতাজী পার্ক ইত্যাদি)।

খ. নয়াগ্রাম বিল : ইংরেজবাজার ব্লকের গাবগাছি-চাতরাল জলাভূমির উত্তরে অবস্থিত নয়াগ্রাম বিল।

গ. সাগর দিঘি : ইংরেজবাজার ব্লকের গাবগাছি-চাতরাল জলাভূমির চত্বরে অবস্থিত বৃহত্তম জলাশয়টি হল সাগরদিঘি। ইসলামিক রাজত্বকালে এটি খনন করা হয়। এটি মালদহ জেলায় খনন করা সর্ববৃহৎ জলাশয়। প্রায় ১০৫ হেক্টর ৭৫০ বিঘা এলাকা নিয়ে বিস্তৃত। জলাশয়টি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য দপ্তরের অধীনে। এই জলাশয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা হয়।

ঘ. লক্ষ্মীপুর বিল : ইংরেজবাজার ব্লকের ৫১ নং রাজ্য সড়কের পাশে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের উল্টোদিকে প্রায় শুকিয়ে যাওয়া একটি বিল। বর্ষাকালে জল থাকে।

দিয়ারা অঞ্চলে কালিয়াচক-১, কালিয়াচক-২, কালিয়াচক-৩ ব্লকে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য জলাভূমিগুলি হল যথাক্রমে—আজগুবা বিল, বাবলা ঢাব বিল, পাতালচণ্ডী বিল, ইংরেজবাজার ও মানিকচক ব্লকের কাজীগ্রাম বিল, অমৃতিঢাব বিল, মালিহা বিল, কাজলদিঘি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এই বিলগুলি প্রায় শুকিয়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন কারণে বিলগুলি মজে যাচ্ছে— তার মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কলকারখানা স্থাপন, শহরাঞ্চলের বিস্তার, রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি। এই সমস্ত বিলে প্রচুর পরিমাণে দেশীয় মাছ থাকত, এখন নানা কারণে সেগুলো আর পাওয়া যাচ্ছে না। মালদহ জেলার বহু মৎস্যজীবী এই বিলগুলির ওপর নির্ভর করেই জীবিকা নির্বাহ করত— এখনও করে থাকে। [১৫]

মালদহ জেলায় বিল, ঝিল, ঢাব, জোলা, ছাড়া প্রচুর দিঘি রয়েছে—

বড় সাগরদিঘি : মালদহ জেলায় খনন করা সর্ববৃহৎ জলাশয় সাগরদিঘি বা বড় সাগরদিঘি। ইংরেজবাজার ব্লকের গাবগাছি চাতরাল জলাভূমির তিরে অবস্থিত। দৈর্ঘ্য ১৪৬০ মিটার প্রস্থ ৭৩০ মিটার। বর্তমানে এটি পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য দপ্তরের অধীনে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা হয়।

ছোট সাগরদিঘি : মালদহ-মহদীপুর রাস্তার পাশে তাঁতিপাড়া মসজিদ ও গুণমন্ত মসজিদকে সমদূরত্বে রেখে পূর্বদিকে উমরপুর মৌজায় ছোট সাগরদিঘি অবস্থিত। বর্তমানে ছোট সাগরদিঘিকে মৎস্য চাষের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এক সময় এই দিঘির মৌরলা ও খয়রা মাছ বিখ্যাত ছিল। গৌড় নগরীর জল সরবরাহ করবার জন্য এই দিঘি খনন করা হয়েছিল বলে অনুমান।

রূপ সাগর : গৌড়ের রামকেলি তমালতলায় উল্টোদিকে অবস্থিত রূপসাগর দিঘি।

পিয়াসবাড়ি বা পিঁয়াজবাড়ি দিঘি : ইংরেজবাজার থেকে প্রায় ৮ কিমি দক্ষিণে মালদহ-মহদীপুর পথের বাঁ পাশে পেঁয়াজ বা পিয়াসবাড়ি নামক স্থানে যে দিঘিটি বর্তমান তার নাম পিয়াসবাড়ি দিঘি বা পিঁয়াজবাড়ি দিঘি।

কুম্ভীর পীর দিঘি : গৌড়ের কদম রসুল দরগা থেকে ১ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত এটি।

হোম দিঘি ও ধূমা দিঘি : প্রাচীন পাণ্ডুয়া নগরীর মধ্যে অতিপ্রাচীন দুটি দিঘি দেখায় এদের নাম হোম দিঘি ও ধূমা দিঘি।

ধানুষ দিঘি : আদিনা মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এটি অবস্থিত।

সাতাশ ঘরা দিঘি : আদিনা মসজিদের ১ মাইল পূর্বে অবস্থিত।

নাসির শাহ দিঘি : অদিনা মসজিদের কাছে অবস্থিত।

সুখান দিঘি : পাণ্ডুয়া প্রাসাদের চত্বরের বাইরে এই বৃহৎ দিঘির অবস্থান।

মেঘ ডুম্বর দিঘি : মালদহ জেলার বামনগোলা থানায় ঐতিহাসিক মদনবতী গ্রামে মেঘ ডুম্বর দিঘি অবস্থিত। উইলিয়াম কেরী প্রায় পাঁচবছর কাল এই দিঘির পাড়ে বসবাস করেছিলেন।

বারোদুয়ারী দিঘি : গৌড়ের বারোদুয়ারী বা বড়োসোনা মসজিদের সামনে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত এই দিঘি।

বালুয়া দিঘি ও খানিয়া দিঘি : গৌড় অঞ্চলে রাজবিবি মসজিদের কাছে এই দিঘি দুটি দেখা যায়।

মালদহ জেলায় ছোটো বড়ো বহু পুকুর আছে— তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— জালালি পুকুর, রতন পোখর (পুকুর), পারা ঢালা পুকুর, জোকাহা পুকুর, বাজরা পুকুর, মিঠা তালাও বা মিঠা পুকুর। [১৬]

মালদহ জেলায় বহু নদ নদী জলাশয় ছিল— বর্তমানে তার অধিকাংশ মজে গেছে বা মজে যাওয়ার পথে। এই সব নদ নদী জলাশয়কে কেন্দ্র করে বহু মৎস্যজীবী জীবিকা নির্বাহ করত। এখনও কমবেশি করে। কিন্তু অধিকাংশ জলাশয়েরই চরিত্র বদল হওয়াতে এবং সরকারী এখতিয়ার (নথীভুক্ত) ভুক্ত হওয়াতে জলাশয়গুলি থেকে সরকার অর্থ উপার্জন করছে। ফলে সরকারের কাছ থেকে লীজ নিয়ে অর্থবান লোকেরা মৎস্যজীবীদের শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করছে। বিভিন্ন কারণে মৎস্যজীবী মালো সম্প্রদায় জল-জাল-মাছ সবের অধিকারই হারাচ্ছে। সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে ব্যবসায়ীরা, একথা বলা যেতেই পারে।

গ. জনগোষ্ঠীর পরিচয় :

মালদহ জেলায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর পরিচয় :

জাতিভেদ প্রথা ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়, মানুষের সৃষ্টি। মহাপুরুষদের কাছে যদিও ঈশ্বরে মানুষে পার্থক্য নেই। পৃথিবীতে সাধারণ মানুষের তুলনায় মহাপুরুষ বা মহামানবের সংখ্যা কম। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে মানবতার প্রসঙ্গ ব্যতীত পড়ে থাকে বেঁচে থাকার সংগ্রামী চেতনা। এই সংগ্রামী চেতনার মধ্যে থেকেই জন্ম নেয় কুটকৌশলী মন্ত্র। এই কুটকৌশলী মন্ত্রই মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টির ইন্ধন জোগায়। এই বিভেদের বহুবিধ কারণ থাকলেও প্রচলিত ধর্মীয় কারণই সামনে আসে। এই ধর্মীয় কারণের সঙ্গে পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কারণ, বর্ণগত-কর্মগত-স্থানগত বিবিধ প্রসঙ্গ যুক্ত হয়ে ঈশ্বর আল্লা-গড-ভগবান ভিন্ন ভিন্ন রূপ পায়। ধর্মে বহুশাখা ও সেই সব শাখার বহু অনুগামীর সৃষ্টি হয়। ভৌগোলিক অবস্থানের সুবিধার জন্য এবং রাজনৈতিক কারণে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যাংশে অবস্থিত প্রাচীন ভূমি গৌড় বা বর্তমানের মালদহে বহু ধর্ম ও পেশার জনগোষ্ঠীর মানুষের আগমন ঘটেছে প্রাচীনকাল থেকে। পরবর্তীকালে কর্ম অনুসারে বহু জাতিগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে এখানে।

'বরেন্দ্রভূমি' এবং 'গৌড়' অতিপ্রাচীন কাল থেকেই সমৃদ্ধ জনপদ। শশাঙ্কের আমল থেকে নবাবী আমলের পূর্বকাল পর্যন্ত বাংলার রাজধানী থাকার জন্য বহু শাসক এ অঞ্চল শাসন করেছেন। তাদের বংশধরেরা কম বেশি এই অঞ্চলে থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক কারণে বারবার মালদহের সীমানা বদল হয়েছে ও বহু জনগোষ্ঠী মালদহে এসেছেন। প্রাচীনকাল থেকে আন্তর্জাতিক নদী বন্দর হওয়ায় এ অঞ্চলের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কালের নিয়মে ইতিহাসের যাত্রাপথে পুন্ড্র, মৌর্য, পাল, সেন, তুর্কি, পাঠান, হাব্‌শি, মামুদশাহী, মোঘল এবং অন্যান্য আরো নামী, অনামী শাসকদের শাসনে এই অঞ্চল বিবর্তিত হয়েছে। মিথিলা, ভোজপুর,

মগধ অঞ্চলের বহু মানুষ কর্ম উপলক্ষ্যে এ অঞ্চলে এসেছিলেন। রাজমহল পাহাড়, সাঁওতাল পরগনা ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে শবর, শাউরিয়া, মালপাহাড়িয়া, পাহাড়িয়া গোষ্ঠীর বহু আদিবাসী মালদহ জেলায় এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। উনিশ শতকের শেষ দিকে মুর্শিদাবাদ থেকে অনেক মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ এসেছেন, স্বাধীনতার আগে পরে বিশেষ করে ১৯৪৭-এর আগে পরে এবং ১৯৭১-এর আগে পরে অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা ও পূর্ব-পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) স্বাধীনতার কালে প্রচুর সংখ্যক মানুষ মালদহে আসেন। রেলপথ স্থাপনের ফলে বিহার থেকে অনেক মানুষ এসেছেন। আম, রেশম এবং অন্যান্য কারণে এখনও মালদহে বাইরের রাজ্য থেকে লোক আসা অব্যাহত রয়েছে। এই সব কারণে এই জেলার জনজাতির বৈচিত্র্য বেশি। এই সব মানুষদের মধ্যে প্রধানত হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ধর্মের লোকই অধিক। তাছাড়া বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান ইত্যাদি ধর্মের মানুষও কিছু সংখ্যক এখানে বসবাস করেন।

১৮৭২ সালে মালদহ জেলায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীগুলি ছিল এইরকম— 'ভড়, ভূমিজ, ধাঙ্গর, খারোয়ার, কোল, পাহাড়িয়া, সাঁওতাল, বাগদী, বাহেলিয়া, বাউরী, বেদিয়া, ভুঁইয়া, বিন্দ, বুনা, চাঁই, চামার ও মুচি, চণ্ডাল, ডোম, দোসাদ, গঙ্গোতা, হাড়ি, কাওরা, করঙ্গা, কোচ, পলি, রাজবংশী, মাহিলী, মাল, মালো, মরকণ্ডে, মেথর, ভুঁইমালী, মুশাহর, পার্সি, রাজওয়ার, ব্রাহ্মণ, রাজপুত, ঘাটওয়াল, কায়স্থ, ভাট, বৈদ্য, আগরওয়ালা ও মারোয়াড়ি, ক্ষত্রী, অসওয়াল, বাক্কাল, বানিয়া, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, গোয়ালা, গরেরি, গানরার, মোদক, কৈবর্ত, আগুরি, বারুই, তামলি, সদগোপ, মালি, কোয়েরি, কুর্মী, নাগর, ধোপা, হাজ্জাম, বেহারা এবং ডুলিয়া, কাহার, ধানুক, কামার, কাঁসারি, সোনার, সূত্রধর, কুমার, লাহেরি, শাঁখারি, গুঁড়ি, তেলি, কলু, তাঁতী, যোগী (যুগী), গনেশ, কপালি, ধুনিয়া, বেলদার, চুনারী, নায়েক, নুনিয়া, পুন্ডারি, কান্ডারী, তুরহা, জালিয়া, মালা, মাছুয়া, তিয়র, পাটনী, পোদ, গন্‌রি, বানফোঁড়, বাথুয়া, কেউট, মুরিয়ারি, সুরাহিয়া, বাইতি, বৈষ্ণব, গোঁসাই, দেশী খ্রীষ্টান এবং মুসলমানদের মধ্যে জুলাহা (জোলা), মুঘল, পাঠান, সৈয়দ, সেখ।'[১৭]

২০১১ র লোকগণনা (Census Report 2011) অনুসারে মালদহ জেলায় বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা 39,88,845/ ৩৯,৮৮,৮৪৫ জন। ২০১১-র লোকগণনা অনুসারে মালদহে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ২,০৫১,৫৪১ জন এবং মহিলা সংখ্যা ১,৯৩৭,৩০৪ জন। জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি.মি.তে ১,০৬৯ জন। শহরাঞ্চলে ৩,৭৩৩ প্রতিবর্গ কি.মি-তে। ভারতের ৬৪০টি জেলার মধ্যে জনসংখ্যার নিরিখে মালদহ জেলার স্থান ৫৮ তম। ২০০১-২০১১ সালে জনসংখ্যার শতকরা বৃদ্ধির হার ২১.৫ শতাংশ। ২০১১ সালে মালদহ জনসংখ্যায় পুরুষ ও মহিলার অনুপাত: পুরুষ ১০০০ জন, মহিলা ৯৩৯ জন। [১৮] এই মানুষদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর যে পরিচয় পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ—

মুসলিম/ মুসলমান :

২০১১ সালের লোকগণনা অনুসারে মালদহ জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই মুসলমান। মুসলমান সম্প্রদায়ের বহু উপ-সম্প্রদায় এই জেলায় বর্তমান। এই সম্প্রদায়ের (ইসলাম ধর্মাবলম্বী) মানুষের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই অংশ দেওয়া হল—

সৈয়দ : এনামূল হক ও আব্দুল করিমের মতে, হজরত মহম্মদ ও ফতেমার বংশধরেরা সৈয়দ নামে পরিচিত। মুসলিম শাসনকর্তারা এই সম্প্রদায়কে উচ্চ মর্যাদা দিতেন। সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ নিজেকে সৈয়দ বংশজাত বলে দাবী করতেন।

শেখ : আরবে বেদুইন গোষ্ঠীপতিদের বলা হত শেখ, কিন্তু বাংলায় নামের সঙ্গে শেখ শব্দের ব্যবহারের নির্দিষ্ট কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। মালদহে অনেকেই (বিশেষ করে টাল-দিয়ারা অঞ্চলের সুন্নি সম্প্রদায়ের পাঠানরা) শেখ পদবি ব্যবহার করেন। এদের মূল ভাষা খোট্টা।

আফগান : তুর্কী সেনাবাহিনীতে বেতনভুক কর্মচারীরূপে এরা এই অঞ্চলে আসেন এবং বসতি স্থাপন করেন। মালদহে বসবাসকারী মুসলিম জনগোষ্ঠীতে এদের সংখ্যা অনেক। এরা খাঁ, মল্লিক পদবি ব্যবহার করে থাকেন।

পাঠান : বাংলায় পাঠান রাজত্বকালে এবং পরে প্রচুর পাঠান মালদহে প্রবেশ করেন। এই সম্প্রদায়ের অনেকগুলি ভাষা আছে।

সুফী : সুফীরা প্রধানত ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এ অঞ্চলে এসেছিলেন মধ্য-এশিয়া অঞ্চল থেকে। বাংলায় বাউল ও সুফী একাকার হয়ে গেছে।

মুঘল/ মোগল : বাংলায় মুঘলরা দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিলেন। রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক কারণে শেখ, বেগ, মীর্জা, উপধিধারী বহু মোগল মালদহ অঞ্চলে এসেছিলেন। পুরাতন মালদহ ও ইংরেজবাজার এলাকায় এই সম্প্রদায়ের লোক বেশি বসবাস করেন।

আরবীয় : কর্ম উপলক্ষ্যে এবং ধর্ম প্রচারের (সুফী) উদ্দেশ্যে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা মালদহ অঞ্চলে এসেছিলেন। হুসেন শাহের রাজত্বকালে এই সম্প্রদায়ের বহু সংখ্যক মানুষ এ অঞ্চলে আসেন। বর্তমানে এই সম্প্রদায় বাংলার সাধারণ মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে গেছে।

বাদিয়া বা শেরশাবাদিয়া :এই জনজাতি বাংলাদেশের শেরশাহবাদ পরগণার অধিবাসী বলে কথিত, যাযাবর, বেদে শ্রেণির সঙ্গে এই জনজাতির যোগাযোগের কথা বলে থাকেন অনেকে (বাদিয়া > বজিদ্যা > বেদে) মালদহ জেলায় এই সম্প্রদায়ের লোক অনেক সংখ্যায় আছেন।

মোমিন, মুমিন, মোমেন, জোলা : বস্ত্র বয়নের সঙ্গে সংযুক্ত মুসলিম জনগোষ্ঠী। আগে দামী বস্ত্র বুনলেও এখন সস্তা লুঙ্গি, শাড়ি, গামছা বোনে। কালিয়াচক অঞ্চলে এদের অধিক বসবাস।

ধুনিয়া/ নাদাব : এই সম্প্রদায়ের লোক তুলো ধনার কাজে যুক্ত। মানিকচক, ভূতনি, দিয়ারা অঞ্চলে এদের বসবাস লক্ষ করা যায়।

পাঁঝরা : ধর্মান্তরিত মুসলিম এই সম্প্রদায় মূলত মাছ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। মালদহ জেলাতেই এদের অবস্থান সীমাবদ্ধ। এদের ভাষা খোট্টা।

কুঁঝড়া : ধর্মান্তরিত মুসলিম এই সম্প্রদায় মূলত শাক-সবজি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত।

দ্বারভাঙ্গিয়া : দ্বারভাঙ্গা থেকে আগত এই মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরা দীর্ঘদেহী, খোট্টাভাষী।

হোসেনী ঘোষ/ হোসেনী গোয়ালা : মুসলিম গোষ্ঠীর এই সম্প্রদায়ের বিবাহিতা মহিলারা সিঁদুর পরেন। হোসেনসাহী আমলে এরা ধর্মান্তরিত হয়— হোসেন শাহের জন্য দুধ জোগানের কাজ অক্ষুন্ন রাখতেই এই ধর্মান্তর বলে জনশ্রুতি আছে।

নদে গুষ্টি বা নাড়ে গুষ্টি : নদীয়া বাসী রক্ষণশীল এই হিন্দু সম্প্রদায় চৈতন্য সমকালে চৈতন্যপন্থীদের দ্বারা তাড়িত হয়ে প্রথমে রাজশাহী এবং পরে পান্ডুয়া অঞ্চলে এসে (হুসেনশাহের অনুগ্রহে এবং ধর্মান্তরীকরণের শর্তে) বসবাস করতে শুরু করেন। বর্তমানে দলদলি গ্রামে এদের বাস। ধর্মান্তরের ফলে মুসলমান হলেও রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের আচার আচরণ তাদের জীবনে কমবেশি রয়ে গেছে।

আরজল : নিম্নবর্ণের হিন্দু বা জল অচল হিন্দু ধর্মান্তরের ফলে 'আরজল' হয়েছেন।

খন্দকার/ খোন্দকার : সম্ভ্রান্ত মুসলিম, প্রধানত চাষাবাদ করে থাকেন।

হাজুম : সুন্নত বা খত্‌নার কাজ করেন যে সব মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা ।

হাজাম/ ললুয়া : নরসুন্দর বা নাপিতের কাজ করে এরা। সুজাপুরের নাজিরপুর অঞ্চলে এরা ললুয়া নামে পরিচিত। এরা অনেক সময় পরামানিক পদবি ব্যবহার করে থাকেন।

পামারিয়া : নবজাত শিশু জন্মগ্রহণ করলে ঢোল বাজিয়ে গান করে এরা পয়সা আদায় করত- হিজরাদের মত। মানিকচকের উগড়িটোলা, কালিয়াচকের রাজনগর এলাকায় এরা থাকেন।

নৈস্য শেখ / নস্য শেখ : ধর্মান্তরিত মুসলিম —সম্ভবত: রাজবংশী থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছিল এরা। এরা জাতি নষ্ট হয়ে মুসলিম হয়েছিল বলে নষ্ট শেখ বা নৈস্য শেখ নামে পরিচিত।

সাঁই/ ফকির : এই সম্প্রদায়ের মুসলিমরা সুফী মতাবলম্বী। মালদহ জেলার ফুলবাড়িয়ার নঘড়িয়া, মোথাবাড়ির দেবীপুর, অচিনতলা, নূরপুরের ফকিরটোলা ইত্যাদি স্থানে এরা বসবাস করেন।

উপরাটিয়া : এরা সেখ সম্প্রদায় ভুক্ত। রেশম চাষ ও পলু পালনের সঙ্গে যুক্ত। মালদহে অনেক সংখ্যায় এরা বসবাস করেন।

চামকাটি : এরা চামড়ার ব্যবসা করত, নিজের দেহের চামড়া কেটে ঈশ্বরকে উৎসর্গ করে কৃপালাভের চেষ্টা করত। গৌড়স্থিত চামকাটি মসজিদে নামাজ পড়ত— এইসব ধারণা কথিত আছে। সম্প্রতি এরা প্রায় বিলুপ্ত।

কাগতি/কাগচা/কাগাজিয়া : এরা কাগজ তৈরি ও পুঁথির নকল করার সঙ্গে যুক্ত ছিল। মুসলিম রাজত্বকালে গৌড়ে পেশাটি যথেষ্ট সম্মানের ছিল। বর্তমানে এরা অন্য পেশায় যুক্ত।

ওস্তাগর/ দরজি : এরা জামাকাপড় সেলাই এর কাজের সঙ্গে যুক্ত।

পটুয়া : এরা পাটের আঁশ তুলে সিক্যা ও অন্যান্য হস্তশিল্পের সামগ্রী নির্মাণ ও বিক্রি করে, পটচিত্র অঙ্কন করে তার সঙ্গে গান গেয়ে বা গল্প বলেও উপার্জন করেন।

মুকেরী/ মুগরি : গবাদি পশুপালন ও গবাদি পশু ব্যবসায়ী এই শ্রেণি।

পিঠারি : এই শ্রেণির মুসলমানরা পিঠা ও রুটি তৈরির কাজে নিযুক্ত।

কাবাড়ি : এরা মাছের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল এক সময়, এখন অন্যান্য পেশার সঙ্গে যুক্ত।

সানাকর/ সানকর : তাঁত তৈরির কারিগর। চিরুনি তৈরি, খোদাই, সান বাঁধাই এর কাজও করে থাকেন।

তিরকর : তির বা শর প্রস্তুতকারী মুসলমান সম্প্রদায়। এই পেশা অবলুপ্তির পথে।

গরসাল : ধর্মান্তরিত মুসলমান, সাধারণত এরা ভিক্ষাকেই জীবিকা করে থাকেন।

মালদহ জেলায় পেশা অনুসারে আরও বেশ কিছু মুসলিম উপগোষ্ঠী দেখা যায়— যারা

বিশ্বাস, মল্লিক, সরকার, চৌধুরী, মণ্ডল ইত্যাদি পদবি ব্যবহার করেন। তাসা, বাজনা, চুড়ি বিক্রি, স্বর্ণালঙ্কার নির্মাণ— ইত্যাদি নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত মুসলিম জনগোষ্ঠীর মানুষ মালদহে বসবাস করেন।

হিন্দু :

মালদহ জেলার জনসংখ্যার নিরিখে (২০১১ সালের Census Report) মুসলমান সম্প্রদায়ের পরেই হিন্দু জনগোষ্ঠীর অবস্থান। মালদহে বসবাসকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক উপ-সম্প্রদায় বর্তমান। এই উপসম্প্রদায়গুলি বর্ণভিত্তিক এবং কর্মভিত্তিকও।

ব্রাহ্মণ : মালদহ জেলায় বসবসকারী ব্রাহ্মণেরা উৎসগত ভাবে বহুস্থানের। সাধারণত এরা মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য, গাঙ্গুলি, চট্ট, ভট্ট, ভাদুড়ী, সান্যাল, ঘোষাল, লাহিড়ী, ঝা, মিশ্র, ওঝা, উপাধ্যায়, পাণ্ডে, দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, তেওয়াড়ি, ইত্যাদি পদবি ব্যবহার করেন। পূজা-অর্চনা ও ধর্মীয় কাজকর্ম ছাড়াও অন্যান্য পেশার সঙ্গেও এরা বর্তমানে যুক্ত।

কায়স্থ : ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত, সরকার, মজুমদার, জোয়ারদার, তরফদার, প্রভৃতি পদবি সাধারণত এই শ্রেণির মানুষেরা ব্যবহার করেন। কৃষিকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি ইত্যাদি নানা পেশার সঙ্গে এরা যুক্ত।

পৌন্ড্র ক্ষত্রিয় : মালদহের প্রাচীন জনজাতি, পোদ, পুড়া জাতি নামেও কথিত। এরাই নাকি আখ চাষ ও গুড় তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। বর্তমানে এরা নানা পেশায় যুক্ত। কালিয়াচক, ইংরেজবাজার, পুরাতন মালদহ, হবিবপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমানে এরা বসবাস করেন।

কৈবর্ত/ ক্যাওট : গাঙ্গেয় উপত্যাকা থেকে এসে বরেন্দ্র অঞ্চলে এরা বসবাস শুরু করেন। জলচারী এই সম্প্রদায় মৎস্যজীবী, নৌকার মাঝি রূপে পরিচিত প্রাচীনকাল থেকেই। এই সম্প্রদায় পেশায় দুটি ভাগে বিভক্ত—কৃষিজীবী কৈবর্ত বা 'হালুয়া' কৈবর্ত, মৎস্য কেন্দ্রিক জীবিকা যাদের তারা 'জালুয়া' কৈবর্ত। মালদহ জেলার অধিকাংশ নদীর তীরে পেশার প্রয়োজনে (কালিন্দ্রী, ফুলহার, টাঙ্গন, পুণর্ভবা, মহানন্দা, গঙ্গা) বসবাস করে।

কৈবর্ত ছাড়া মৎস্য কেন্দ্রিক জীবিকার সঙ্গে বংশ পরম্পরায় যারা যুক্ত— মালদহে বসবাসকারী এমন জনগোষ্ঠী হল ধীবর, কুলীনগুড়ি, জালিয়া, জেলে, জালওয়া, জুলুয়া, ঝালোমালো, মালুয়া, মালো, মালা, মাছুয়া।

রাজবংশী: বরেন্দ্র এবং টাল অঞ্চলে এদের বসবাস বেশি, এদের মূল পেশা কৃষিকাজ ও কখনো মৎস্য শিকার।

কোচ : সামাজিক পেশা, মান মর্যাদার ক্ষেত্রে রাজবংশীদের পাশাপাশি এদের অবস্থান। বরেন্দ্রী ও টাল অঞ্চলে এদের বসবাস।

দেশি/ গৌড় দেশি : গৌড় এলাকায় বসবাসকারী, কৃষিকর্মের সঙ্গে যুক্ত। হবিবপুর, বামনগোলা, গাজোল, পুরাতন মালদহে এরা বসবাস করেন।

পলি/ পলিয়া : রাজবংশী সম্প্রদায়ের একটি উপবিভাগ বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। পলিয়াদের দুটি ভাগ— ক. বাবু পলিয়া, খ. সাধু পলিয়া। মূলতঃ এরা কৃষিজীবী। বরেন্দ্রী অঞ্চল বিশেষ করে বামনগোলা, হবিবপুর, পুরাতন মালদহ, গাজোল অঞ্চলে এরা বসবাস করেন।

সাঁওতাল : বিহার, ঝাড়খণ্ড, বিশেষত: সাঁওতাল পরগনা থেকে বরেন্দ্রী এলাকাতে এসে বসবাস করছে বহুকাল থেকে। হবিবপুর, বামনগোলা, পুরাতন মালদহ, গাজোল, অঞ্চলে এরা অধিকসংখ্যায় আছে। কিস্কু, হেমব্রম, সোরেন, মার্ডি, হাঁসদা, চড়ে, টুডু, বাস্কে, বেসরা, মুর্মু ইত্যাদি পদবি ব্যবহার করে এরা। মূলত শিকার ও কৃষিকাজ এদের জীবিকা।

শবর / শৌরিয়া : বরেন্দ্রভূমিতে বসবাসকারী আদিম জনগোষ্ঠী। এদের জীবন-জীবিকার সঙ্গে বন-জঙ্গল, পাহাড়-শিকার ইত্যাদি বিষয়গুলি যুক্ত।

মাল পাহাড়ি/ মাল পাহাড়িয়া : এরা সূর্য উপাসক। মন্ত্র-তন্ত্র, তুক-তাক, এ সবে বিশ্বাসী। পাহাড়িয়াদের মধ্যে কয়েকটি উপসম্প্রদায় হল— কুজুর, কেরকেটা, পাহাড়িয়া মুন্ডা, ওঁরাও, তিরকি।

ডোম : বাংলার এক প্রাচীন জনজাতি। এরা মূলতঃ শবদেহ সৎকারের কাজ করে। নালা-নর্দমা, শৌচালয় সাফ করার কাজ ছাড়াও কুলা-ডালা-চালন, সাজ, চাটাই, বাঁশের ঝুড়ি, চাঙারি ইত্যাদি তৈরি করেও জীবিকা নির্বাহ করে। ইংরেজবাজার, রতুয়া, মানিকচক, চাঁচল, ওল্ড মালদহ অর্থাৎ মালদহ জেলার প্রায় সর্বত্রই এরা আছেন।

হাড়ি/ হাঁড়ি : নিম্নবিত্ত ও অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়। মালদহ জেলার পুরাতন মালদহ, ইংরেজবাজারে এদের বাস অল্প সংখ্যক।

মুচি / চামার : মৃত পশুর চামড়া ছাড়ানো ও চামড়া জাত দ্রব্য নির্মাণ এদের পেশা। মালদহ জেলায় এদের পাঁচটি উপসম্প্রদায় দেখা যায়— দাস (রবিদাস), ঋষি, খারদাহা, বিটাল ও কুড়ল। মালদহ জেলার সর্বত্রই এরা কমবেশি বসবাস করেন।

ভু সুন্দর/ ভুঁইমালি : মালদহের বরেন্দ্র এলাকায় এদের বসবাস। বাঁশ দিয়ে ঝুড়ি, কুলো, চাঙারি নির্মাণ এদের পেশা।

নমশূদ্র : মালদহের বরেন্দ্রী এলাকায় এবং অন্যত্র বসবাসকারী এই সম্প্রদায় সমাজবদ্ধ, স্বাধীনচেতা, ক্ষত্রিয়দের মত লড়াই পারদর্শী এক জাতি। কৃষি ও নৌচালনা এদের প্রধান জীবিকা ছিল। বর্তমানে এদের মধ্যে শিক্ষার হার যথেষ্ট বেড়েছে। অন্যান্য পেশায় এরা অংশও নিচ্ছেন।

চাঁই : বিহার ও মধ্যবাংলায় কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায় এই মানুষেরা প্রধানত মালদহ জেলার দক্ষিণ অংশে বা টাল, দিয়ারা অংশে বসবাস করেন। এরা মূলত 'মণ্ডল' পদবি ব্যবহার করেন। এরা সাধারণত খোট্টা ভাষায় কথা বলে থাকেন।

নাগর : কৃষিজীবী সম্প্রদায় বিহার, ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগনা থেকে আগত। নাগররা পাঁচটি উপসম্প্রদায়ের বিভক্ত— ১. জেঠাউত, ২. পুলাউনস, ৩. নাগবংশী, ৪. কথেটটিয়া, ৫. ভাট নাগর। এরা খোট্টা ও বাংলা ভাষায় কথা বলে। এরা সাধারণত মণ্ডল পদবি ব্যবহার করে। ইংরেজবাজার, কালিয়াচক-২ অঞ্চলে এরা বেশি থাকেন।

বিন, বিন্দ : 'উত্তর ভারত তথা বিহারের এক বিরাট কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী, শিকারী সোরা তৈরি, মাটি কাটার কাজে যুক্ত , তথা ভেষজ লতাপাতা সংগ্রহকারী এক অন-আর্য জাতি এই বিন্দরা'। বিন্দ সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি উপসম্প্রদায় দেখা যায়। মালদহ জেলার মানিকচক অঞ্চলে— যথা ১. জেঠাউত বিন্দ, ২. ভাটিয়া বিন্দ, ৩. নুন্ বিন্দ, ৪. আহীর বিন্দ, ৫. গোয়াল বিন্দ, ৬. মালাউ (মল্লি) বিন্দ, ৭. কেওট বিন্দ। এই সম্প্রদায় খোট্টা, ভোজপুরি, বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন।

ধানুক : বিহারের কৃষিজীবী এক সম্প্রদায় ধানুক। বিত্তবান গৃহস্থ পরিবারে পরিচারকের কাজ করত। বর্তমানে অন্যান্য পেশায় যুক্ত। ইংরেজবাজার, কালিয়াচক, হরিশ্চন্দ্রপুর, মানিকচক, হবিবপুর, রতুয়া ইত্যাদি এলাকায় এদের বসবাস লক্ষ করা যায়।

গোপ, গোয়ালা : মূলত গবাদি পশু পালন, দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন, কৃষিকাজ এদের জীবিকা। মালদহ জেলায় এরা প্রচুর সংখ্যায় বসবাস করে।

সদগোপ : গোয়ালা সম্প্রদায়ের আর একটা ভাগ সদগোপ, এরা মূলত কৃষিজীবী।

কামার/ কর্মকার : মূলত ধাতু দিয়ে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী গড়ে। মালদহ জেলার সর্বত্র এরা থাকেন, দিয়ারা অঞ্চলে এদের বসবাস অধিক।

কুমার, কুমোর, কুম্ভকার : এরা মূলত মৃৎ শিল্পী, পাল পদবি ব্যবহার করে, মালদহ জেলার প্রায় সর্বত্রই এদের বসবাস।

স্বর্ণকার : সোনা ও রূপার অলঙ্কার নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে এরা যুক্ত। মালদহ জেলায় ইংরেজবাজার এলাকায় এরা অধিক সংখ্যক বসবাস করে।

ধোপা/ রজক : এরা জামাকাপড় ধোয়ার কাজ করে প্রধানত। পুরাতন মালদহে এদের বসবাস। উপাধি সূত্রে এরা রজক। জীবিকা সূত্রে ধোপা।

নাপিত : এরা ক্ষৌরকর্মের সঙ্গে যুক্ত। মালদহ জেলায় সর্বত্রই এদের দেখা যায়। ইদানিং ঝাড়খণ্ড, বিহার থেকে আগত 'ঠাকুর' পদবিধারী নর সুন্দররাও মালদহে কর্ম উপলক্ষ্যে বসবাস করেন।

মালাকার : ফুল উৎপাদন, মালা বিক্রির কাজ ছাড়াও শোলার অলংকার, টোপর ইত্যাদি তৈরির কাজ করে এরা। ইংরেজবাজার ,কালিয়াচক, মথুরাপুর ইত্যাদি অঞ্চলে এরা বসবাস করেন।

দোসাদ : কৃষিকাজ, অশ্বপরিচর্যা এদের জীবিকা, বিহার ও ছোটনাগপুর থেকে এরা এসেছিলেন এই জেলায়।

মুসাহর : আলাদা কোন পেশা বা সংস্কৃতি নেই। মালদহ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানিকচক, রতুয়া, চাঁচলে এরা বসবাস করেন।

নুনিয়া : লবণ উৎপাদন ও লবণ বিক্রির পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিল। এখন ভিন্ন পেশা অবলম্বী। মালদহ জেলায় ইংরেজবাজার, হরিশ্চন্দ্রপুর, পুরাতন মালদহ, চাঁচল, রতুয়া এলাকায় এরা বসবাস করেন।

গঙ্গোতা : গঙ্গাতীরে বসবাসকারী, বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকে আগত এই জনগোষ্ঠী কিছু সংখ্যক মালদহ জেলায় বসবাস করেন।

কাহার : অতীতে পাল্কীবাহন এদের পেশা ছিল। এখন অন্যান্য পেশায় যুক্ত। মালদহ জেলার অল্পসংখ্যক মানুষ (এই সম্প্রদায়) বসবাস করেন।

কিষান/ কিসান : দিয়ারা অঞ্চলে গঙ্গা ভাঙনের ফলে নতুন জেগে ওঠা চর এলাকায় কৃষিকাজে দক্ষ এই সম্প্রদায় বসবাস করেন।

গনেশ : চাঁচল থানার প্রায় সর্বত্র পুরাতন হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে গনেশ নামে একটি সম্প্রদায় বসবাস করে। এদের আদি পেশা ছিল তাঁত বোনা।

বাগদি : এই জনজাতির পেশা— চাষবাস, দাসবৃত্তি, মৎস্য শিকার। বাগবাড়ি, ৫২ বিঘা, সামসী, চাঁচল এলাকায় এদের দেখা যায়।

পুলিন্দ : প্রাচীন জনজাতি, ইংরেজ আমল থেকে মালদহ জেলার হবিবপুর, বামনগোলা, পুরাতন মালদহে বসবাস করেন।

কুর্মী : বিহার, ঝাড়খণ্ড এলাকা থেকে আগত। নানা পেশায় যুক্ত। হবিবপুর, বামনগোলা, গাজোল, ইংরেজবাজার এলাকায় দেখা যায়। মাহাতো পদবি ব্যবহার করে। কৃষিকাজ, ধান ঝাড়াই-মারাই পেশা।

কাপালি/ বৈশ্য কাপালি : পুরাতন মালদহ, হবিবপুর, বামনগোলা এবং অন্যান্য অঞ্চলে এরা বসবাস করে। সাধারণত পূর্ববঙ্গের থেকে এই জেলায় এসেছেন। ধর্মে হিন্দু-শৈব ও বৈষ্ণব মতাবলম্বী।

কোঁড়া : মুন্ডা সম্প্রদায়ের শাখা বিশেষ আদিবাসী জনজাতি। জীবিকার প্রয়োজনে বিহার থেকে এসে পশ্চিমবঙ্গে বসবাস শুরু করে। মূলত শিকারজীবী। সাঁওতাল জনজাতির সঙ্গে সাযুজ্য আছে। কৃষিজমি তৈরি ও বনজঙ্গল পরিষ্কারের কাজে এরা পারদর্শী। গাজোল, পুরাতন মালদহ, হবিবপুরে এরা বাস করেন।

ভূমিজ : মুন্ডাদেরই শাখা বিশেষ, আদিবাসী জনজাতি। আদি বাসস্থান অযোধ্যা পাহাড়, ছোটনাগপুর অঞ্চল। কৃষিজীবী সম্প্রদায়। পুরুষেরা পশু শিকার করে এবং মৎস্য শিকারও করে। মালদহে সাঁওতাল মুন্ডাদের পাশাপাশি এদের বাসস্থান।

মাহালি : সাঁওতাল জনজাতির একটি বিচ্ছিন্ন শাখা। পেশাগত কারণে এরা পাঁচটি শাখায় বিভক্ত। মূলপেশা ঝুড়ি ও বাঁশের নানা রকম জিনিস তৈরি করা। মালদহ জেলায় কম সংখ্যক এই

জনজাতির মানুষের বাস। এদের ভাষা মুন্ডারী। বামনগোলা, হবিবপুর, পুরাতন মালদহ, গাজোল অঞ্চলে এরা বসবাস করেন।

খারওয়ার/ খাড়িয়া : খাড়িয়া ও খারওয়ার-রা আদি কোল গোষ্ঠীর অন্তর্গত উপজাতি। অরণ্যাকীর্ণ স্থানেই এদের বসবাস। গ্রীর্য়াসন সাহেবের মতে এরা অষ্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠীর একটি শাখা। বর্তমানে এরা অনেকগুলি গোত্রে বিভক্ত। খারওয়ারিদের মতে তারা — ১. চাঁই মণ্ডল, ২. নাগর মণ্ডল, ৩. বিন্দ মণ্ডল, ৪. ধানুক মণ্ডল, ৫. পলাশ নাগর এই সব ভাগে বিভক্ত। এরা বিভিন্ন রকম পেশার সঙ্গে যুক্ত। রতুয়া, মানিকচক, চাঁচল, গাজল, হরিশ্চন্দ্রপুর অঞ্চলে এদের বসবাস।

লোধা : ইংরেজ রাজত্বকালে এরা অপরাধপ্রবণ জাতি হিসাবে চিহ্নিত ছিল। এরা প্রকৃতপক্ষে ব্যাধ বা শিকারি সম্প্রদায়ের। লোধারা নিজেদের শবর জাতির শাখা বলে মনে করে। আদি নিবাস মধ্যপ্রদেশ। শিকার, কাঠ সংগ্রহ, মধু সংগ্রহ, মজুরি খাটা এদের প্রধান জীবিকা। হবিবপুর, গাজোল, পুরাতন মালদহ, রতুয়ায় এরা বসবাস করেন।

মুন্ডা : ভারতবর্ষের প্রাচীনতম জনগোষ্ঠী। বন জঙ্গল বা অরণ্য প্রদেশে এদের স্থায়ী বসবাস। ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণা, বালেশ্বর, ময়ূরভঞ্জ, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, দিনাজপুর, মালদহ জেলায় এরা বসবাস করে। মূল পেশা কৃষিকাজ। ভারতীয় আর্যভাষা ও সংস্কৃতিতে এদের দান অপরিসীম। চাঁচল, গাজোল, পুরাতন মালদহ, হবিবপুর এবং বামনগোলা অঞ্চলে এরা বসবাস করেন।

ওঁরাও : একটি আদিবাসী সম্প্রদায়। আদি বাসস্থান ছোটনাগপুরের অরণ্যভূমি। দ্রাবিড়, কৃষিজীবী, মুন্ডাদের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। ঝুমুর নাচ ওঁরাও রমনীদের বিশেষ প্রিয়। মূল উৎসব সরহুল। বামনগোলা, হবিবপুর, পুরাতন মালদহ অঞ্চলে এই জনজাতি বসবাস করেন।

পাটনি : মূল পেশা নৌচালনা, মাছ ধরার সঙ্গে ও কমবেশি যুক্ত। নদী মজে যাওয়া ও ব্রীজ নির্মাণের ফলে খেয়া পারাপার বন্ধ হয়েছে এবং এরাও পেশা পরিবর্তন করেছেন।

নেড়া, নেড়ি : হুসেনশাহী কালে মালদহের রামকেলি অঞ্চলে এরা বসবাস করতেন। অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ — বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত।

যোগী, যুগী, নাথ : এরা মূলত শৈব ধর্মাবলম্বী একটি সম্প্রদায়। এরা মালদহ জেলায় 'দশনামী' সম্প্রদায় হিসাবেও পরিচিত, বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও পূর্বে পূর্ববঙ্গে এরা প্রধানত তাঁত বোনার কাজে যুক্ত ছিলেন।

বরাচেইন/ চেইন/ চেই : এরা বিহারের মুঙ্গের, ভাগলপুর থেকে মালদহে প্রবেশ করেছেন। চেইন সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেণিগত বিভাজন তিনটি— ১. ভাটিয়াল বাংলাদেশ, ২. শিরোয়াল, ৩. ছোট/ ছুট চেন সম্প্রদায়। মূলপেশা দিনমজুরী ও কৃষিকাজ। গাজোল, কালিয়াচক, ভূতনী, কাটাহাদিয়ারা অঞ্চলে এদের বসবাস।

বারুই : মূলত পান চাষী। এরা নিজেদের বৈশ্য বলে পরিচয় দেন। পূর্ববঙ্গের রাজশাহী, দিনাজপুর জেলা থেকে এরা মালদহে এসেছেন। বাহারাল, ফতেপুর, চোরলমণি, পাকুয়া, মুচিয়া, আইহো-তে এদের বসবাস।

বণিক, বেনে: মঙ্গলকাব্যে এদের উল্লেখ আছে। বহু প্রাচীনকাল থেকে এবং অনেক সংখ্যায় এরা বাংলায় বসবাস করে আসছে। অর্থে-বিত্তে এরা সর্বদা এগিয়ে কংস বণিক, কাংস বণিক, গন্ধ বণিক, ইত্যাদি ভাগে এই সম্প্রদায় বিভক্ত। দে, দত্ত, চন্দ্র, আঢ্য, শীল, সিংহ, বড়াল, ধর, লাহা, পাল, নাথ, মল্লিক, রায়, নন্দী, বর্ধন, দাস, সেন ইত্যাদি পদবি ব্যবহার করে থাকেন। মালদহের ইংরেজবাজার অঞ্চলে বেশি বসবাস করেন। এছাড়াও অন্যান্য অঞ্চলে বসবাস করেন।

মোদক : মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক একটি সম্প্রদায়। আদি পেশা বিশেষ প্রকার মিষ্টান্ন, হালুয়া প্রস্তুত। মালদহ জেলার প্রায় সর্বত্রই কমবেশি এদের দেখা যায়। কাশ্যপ, শান্ডিল্য, গৌতম ইত্যাদি গোত্র এবং বরাট, দাস, নাগ, দে, নন্দী, রশিত ইত্যাদি পদবি ব্যবহার করে থাকেন।

শেঠ : পান্ডুয়া যখন সমৃদ্ধ জনপদ ও বন্দর তখন থেকেই (মুসলমান রাজত্বের কাল) ধনবান শ্রেষ্ঠিরা গৌড়ে বসবাস ও বাণিজ্য করত। পাঠান রাজত্বকালে তারা শেঠ উপাধি পায় বলে অনুমান। মালদহের কিছু সংখ্যক শ্রেষ্ঠি বা শেঠ বসবাস করেন।

পণ্ডিত : কনৌজিয়া শ্রেণির কাশ্যপ গোত্রধারী কুম্ভকার সম্প্রদায়— যারা পাটনা থেকে প্রথমে গৌড়ে পরে মালদহ শহরে বসবাস করে। হাটখোলা ও বালুচর ছাড়াও মালদহের অন্যত্র এরা বসবাস করেন। পণ্ডিত পদবি ত্যাগ করে অনেকেই বর্তমানে 'পাল' পদবি ব্যবহার করছে।

মারোয়াড়ি : মূলত রাজস্থানে মারোয়ার -মাড়বার প্রদেশ থেকে আগত এই বস্ত্র ব্যবসাদার সম্প্রদায় মালদহে অনেক প্রাচীনকাল থেকেই বসবাস করছেন। আচারগত ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত— ১. আগরওয়াল ২. মাহেশ্বরী। আগরওয়ালারা জৈন, মাহেশ্বরীর হিন্দু, শৈব উপাসক। মালদহে চৈতন্য আগমনের প্রভাবে উভয় সম্প্রদায়ই সনাতন বৈষ্ণব ধর্মের রীতি পালন করেন।

খ্রিস্টান :

উইলিয়াম কেরী আগমনের (১৭৯৩ খ্রি:) আগেই মালদহ জেলায় খ্রিস্টানদের আগমণ ঘটেছিল। মালদহে ধর্মপ্রচার ও শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এবং কৃষি-বিজ্ঞান চর্চা ও প্রয়োগে উইলিয়াম কেরী তথা 'মদনাবতী পর্ব' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরাধীনতার কালে এবং পরবর্তী সময়ে বহু মানুষ খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে অধিকাংশই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ এবং অন্য সম্প্রদায়ের সামান্য মানুষও রয়েছেন। আদিবাসী জনসমাজে ধর্মান্তরিত হবার প্রক্রিয়া বর্তমানেও অব্যাহত। আর্থিক ও সামাজিক নানা সুযোগ সুবিধার কারণে মালদহের বিশেষ করে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল— হবিবপুর, বামনগোলা, গাজোল, ওল্ডমালদা প্রভৃতি অঞ্চলের আদিবাসী মানুষরা ধর্মান্তরিত হয়েছেন বেশি। ইংরেজবাজার শহরেও এই ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন।

শিখ :

১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দ শিখ গুরু নানক মালদহে এসেছিলেন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে। তাঁর শিষ্য প্রচারের সঙ্গী ভাজুজির তত্ত্বাবধানে মালদহে এই ধর্মের প্রচার হয়। সেই সময় এই ধর্ম সম্প্রদায়ের অল্পসংখ্যক মানুষ মালদহ জেলায় বসবাস করেন।

জৈন :

ব্যবসা বাণিজ্য সূত্রে মূলত মালদহ শহরে কিছু সংখ্যক জৈন ধর্মাবলম্বী মানুষ আছেন। এরা প্রধানত মারোয়ারি।

বৌদ্ধ :

এককালে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা অনেক থাকলেও বর্তমানে খুব কম সংখ্যক এই ধর্মের মানুষ বাস করেন মালদহ জেলায়। মূল জনসংখ্যার ০.১ শতাংশের কম।

মালদহে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য—

কর্মসূত্রে ভারতে অন্যান্য অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্মের মানুষ মালদহে এসে বসবাস করার ফলে মালদহের স্থায়ী বাসীন্দায় পরিণত হয়েছেন। [১৯]

মালদহে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য

ধর্ম :

মালদহ জেলা প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক দিক থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রাচীনকাল থেকেই (মালদহ জেলা গঠনের পূর্বে) এ অঞ্চলে বিভিন্ন রাজশক্তির আগমন ঘটে ও বাংলা রাজধানী হবার সুবাদে— বহু জনজাতি এখানে আসেন। বিভিন্ন সময়ে আগত জনজাতির ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি কখনও স্বতন্ত্রভাবে কখনও মিশ্ররূপে বিরাজিত ছিল। এছাড়াও মালদহ জেলায় বহু মহাপুরুষের আগমনের ফলে সেই-সেই ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না।

বর্তমানে মালদহ জেলায় হিন্দু এবং মুসলিম এ দুটি সম্প্রদায়েরই আধিক্য। এছাড়া অন্যান্য ধর্মের- বিশেষ করে বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান ইত্যাদি ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যাও কিছু পরিমাণে আছে। ২০১১র আদমসুমারী অনুসারে মালদহ জেলায় মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা হিন্দুর তুলনায় বেশি। কিন্তু ২০১১-র পূর্বে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যাই ছিল বেশি। এই দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মানুষেরা রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় কারণে ধর্মান্তরিত হয়েছেন —এমন ঘটনাও বিরল নয়। আবার মালদহ জেলায় বহুধর্মী কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকায়- হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পেশা ভিত্তিক জাতি-গোষ্ঠীরও সৃষ্টি হয়েছে। এবং প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেও আবার নানা উপসম্প্রদায়ের অস্তিত্বও চোখে পড়ে। এই সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পালনীয় সংস্কার বা রীতিনীতির বৈচিত্র্য মালদহ জেলায় চোখে পড়ার মত। মালদহ জেলাকে বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ বিশেষ ধর্মাবলম্বী মানুষের পালনীয় ধর্মের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় (রামকেলিতে বৈষ্ণবধর্মের মানুষ, পাণ্ডুয়ায় পীরফকিরের পীঠস্থান পাণ্ডুয়া মেলা, ইদ, মহরম- মালদহ শহরে ও মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে —রতুয়া, হরিশ্চন্দ্রপুর, কালিয়াচক অঞ্চলে; হবিবপুর, বামনগোলা, গাজোলে, ওল্ড মালদহে রয়েছে বড়দিনের উৎসব, বরিন্দ এলাকায় আদিবাসীরা তাদের সাবেক আদিবাসী ধর্ম উৎসব পালন করেন খ্রীষ্টধর্মের উৎসবের পাশাপাশি)। দোল, দেওয়ালী,দুর্গোৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয় মালদহে। এছাড়া নিজেদের ধর্ম-সম্প্রদায়ের উল্লেখ করতে চায়না এমন মানুষও মালদহে আছেন। অন্যান্য অনেক অপ্রধান ধর্ম সম্প্রদায়ের অল্পসংখ্যাক মানুষ এ জেলায় বাস করেন, তাদের ধর্মীয় প্রভাব খুব একটা চোখে পড়ে না।

১৯৭১— ২০০১ মিশ্র সংস্কৃতির নমুনা ধর্মভিত্তিক মানুষের সংখ্যা, মালদহ জেলায় [২০]

সম্প্রদায়	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১	২০০১
হিন্দু	৯,১৩,২৮৩	১১,০৭,১৯২	১৩,৭৭,৮৪৪	১৬,২১,৪৬৮
মুসলিম	৬,৯৫,৫০৪	৯,১৯,৯১৮	১২,৫২,২৯২	১৬,৩৬,১৭১
খ্রিস্টান	৩,৪৫২	৪,০২০	৫,১১৮	৮,৩৮৮
বৌদ্ধ	৫১	১০৮	৬৪	১৬৪
জৈন	১৯১	৩৫৯	২২৪	২৯৩
শিখ	১৩৬	১২৭	১৮৩	২৮৩
অন্যান্য	—	—	১,৩০৭	২২,৩৫০
ধর্মের উল্লেখ নেই এমন	—	—	—	১৩৫১

বিভিন্ন ধর্মের জনসংখ্যার শতকরা হার [২১]

সম্প্রদায়	১৯৯১	২০০১	২০১১
হিন্দু	৫২.২৪৯৮ %	৪৯.২৭৭৭৩%	৪৬.৯৭
মুসলিম	৪৭.৪৮৮৬৯ %	৪৯.৭২৪৫৬ %	৫২.০৫
খ্রিস্টান	০.১৯৪০৮ %	০.২৫৪৯ %	—
বৌদ্ধ	০.০০২৪২ %	০.০০৪৯৮ %	—
জৈন	০.০০৮৪৯%	০.০০৮৯%	—
শিখ	০.০০৬৯৩ %	০.০০৮৬ %	—
অন্যান্য	০.০৪৯৫৬ %	০.৬৭৯২৯ %	—
ধর্মের উল্লেখ নেই এমন	—	০.০৪১০৫ %	—

জীবিকা :

মালদহ জেলার মালদহ শহরে বসবাসকারী মানুষের থেকে গ্রামে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা অধিক। মালদহ জেলায় একমাত্র বড় শহর মালদহ। মালদহ শহর ছাড়া কিছুটা উন্নত চাঁচল, গাজোল, পাকুয়ার অর্থনীতি প্রধানত কৃষিনির্ভর। ফলে মালদহ জেলার অধিকাংশ মানুষের জীবিকা কৃষিকেন্দ্রিক, একথা বলাই যায়। মালদহ জেলায় ধান, পাট, গম, সবজি, আম, কলা, লিচু, রেশম ইত্যাদির চাষ বড় মাত্রায় হয়ে থাকে। আম ও রেশমকে কেন্দ্র করে অন্যান্য শিল্প গড়ে উঠেছে (আচার শিল্প, সেলাই)- সেখানেও বহু মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে। হাল আমলে বহু পল্ট্রী ফার্ম ও মাছ চাষের কাজেও বহু মানুষ নিযুক্ত রয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমেও বহু মহিলা বিভিন্ন রকম পেশার সঙ্গে যুক্ত। মালদহ জেলার বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-অফিস, আদালতে, চাকুরীরত মানুষও রয়েছেন বেশ কিছু। কৃষি ছাড়া ব্যবসা বাণিজ্যও বহু মানুষের জীবিকার উপায়। ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ব্যবসায়ীর সংখ্যাই মালদহে বেশি। মালদহ গাজোলের মাঝামাঝি- অংশে জাতীয় সড়ক সংলগ্ন অঞ্চলে (নারাণপুর) গড়ে উঠেছে শিল্পাঞ্চল, বেশ কিছু কল কারখানা রয়েছে এখানে। এই কল-কারখানাকে কেন্দ্র করেও কিছু মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে। মুর্শিদাবাদের মতো মালদহতেও অনেক মানুষ বিশেষত মহিলারা বিড়ি বাঁধার কাজকে জীবিকা হিসেবে নিয়েছেন। শহরে পরিচারিকার কাজেও অনেক মহিলাকে নিযুক্ত হতে দেখা যায়। এছাড়া শহরে মাছ, সবজি বিক্রি করেও অনেক মানুষের জীবিকা নির্বাহ হয়।

মালদহ জেলার একটা বড় অংশের মানুষ কাজ না পেয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে 'বিদেশখাটা' শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। জীবিকার সন্ধানে ভিন রাজ্যে শুধু নয় ভিন দেশেও পাড়ি দিয়েছে অনেক মানুষ।

শিক্ষা :

শিক্ষার ক্ষেত্রে মালদহ পশ্চিমবঙ্গে একটি পিছিয়ে পড়া জেলা। তা সত্ত্বেও বেশ কিছু পুরোনো নামীদামী হাইস্কুল এখানে রয়েছে- মালদা জিলা স্কুল, বার্লো গার্লস হাইস্কুল, এ.সি. ইনস্টিটিউশন, ললিতমোহন হাইস্কুল, বেশ কিছু ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ইত্যাদি।

এক সময়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা মালদা কলেজ (১৯৪৪) বর্তমানে মালদহ শহরে অবস্থিত গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রয়েছে। মালদা কলেজে বর্তমানে এম.এ ও পড়ানো হয়।

মালদহে অবস্থিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়-

বিশ্ববিদ্যালয়	কলেজ
১. গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। ২. গণিখান চৌধুরী ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি	১. মালদা কলেজ ২. আই.এম.পি.এস কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ৩. মালদা মহিলা মহাবিদ্যালয় ৪. গৌড় মহাবিদ্যালয় ৫. সামসী কলেজ ৬. চাঁচোল কলেজ ৭.সাউথ মালদা কলেজ ৮. সুলতানগঞ্জ কলেজ ৯. পাকুয়াহাট ডিগ্রি কলেজ ১০. মালদা মেডিকেল কলেজ এন্ড হস্পিটাল ১১. মালদা পলিটেকনিক কলেজ ১২. সামসী ও হবিবপুরে নতুন দুটি কলেজ হয়েছে আই.টি.আই) ১৩. মানিকচক ডিগ্রি কলেজ

অনেকগুলি প্রাইভেট বি.এড কলেজ, বহু সংখ্যাক প্রাইভেট নার্সারি স্কুল, বহু মাদ্রাসা, এস.এস.কে এবং এম-এসকে স্কুল রয়েছে এই জেলায়। এছাড়া মালদহ জেলায় জেলা গ্রন্থাগার সহ অনেক গ্রন্থাগার অবস্থিত। মালদহ জেলা থেকে অনেকগুলি পত্র-পত্রিকা, নিয়ামিতভাবে প্রকাশিত হয়। অনেকগুলি প্রকাশনা সংস্থাও এখানে আছে।

সংস্কৃতি :

'যার দ্বারা আত্মার সংস্কার সাধিত হয়, তাই-ই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি জাতির জীবিকার অবলম্বন। সংস্কৃতি জাতির মানসসম্পদ।..... ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত থেকে আরম্ভ করে অভিনয়, চিত্রকলা, স্থাপত্য ইত্যাদি নানা উপাদানে গঠিত সংস্কৃতিক অবয়ব। ধর্ম, সামাজিক মূল্যবোধ, লোকাচার, লোকবিশ্বাস, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-আশাক, চলন-বলন, ব্যবহার্য উপকরণ এবং হাতিয়ার

সবই সংস্কৃতির অর্ন্তভুক্ত।' [২২]

'সংস্কৃতি জীবনের সঙ্গে জড়িত- সেই জন্য এর চরম রূপ কোনও এক সময়ে চিরকালের জন্য বলে দেওয়া যেতে পারে না। জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা আর সংস্কৃতিও গতিশীল ব্যপারে।' [২৩]

মালদহ জেলা মিশ্র সংস্কৃতির অবস্থান। ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই জেলায় বহু ধর্ম, ভাষার লোক বসবাস করে বহুকাল থেকে। মালদহ জেলার সংস্কৃতিকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বিভাজন করা কঠিন। এই জেলায় সাধারণ সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির ধারা পাশপাশি চলেছে বহুকাল থেকেই। লোকসংস্কৃতির ধারাই অধিক সক্রিয়। সাধারণ সংস্কৃতি জগতেও নানা পরিবর্তন লক্ষ করার মত। মালদহ জেলায় বহু জাতি ধর্মের মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতিও সক্রিয় আছে। তবে উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতির ধারাগুলি নিম্নরূপ-

সুপ্রাচীন কাল থেকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চর্চার সুপ্রসিদ্ধ ঘরানা মালদহে বর্তমান। সাধারণ সংস্কৃতি চর্চার অঙ্গ হিসেবে ব্যান্ড, রিয়ালিটি শো, নাট্যচর্চা, কবিতা লেখা, পাঠ, আবৃত্তি, চিত্রকলার চর্চা, সঙ্গীত, নৃত্যচর্চা, ইতিহাস চর্চা, বিজ্ঞান চর্চা, গবেষণা ও গবেষণাধর্মী বিষয়- চর্চা হতে দেখা যায়। পাশাপাশি লোকসংস্কৃতি ধারায়- ভাটিয়ালি, কবিগান, পাঁচালি ও ধর্মগ্রন্থ পাঠ, গম্ভীরা, ডোমানি, আলকাপ, মনসা গান, মঙ্গলচণ্ডীর গীতি, রামের বনবাস, সীতার বনবাস, ঝাড়নি গান, সাঞ্জা/সানঝাব্রতের গান, সোনারায়ের পূজার গান, হোলির গান, কীর্তন (পালাকীর্তন, নাম সংকীর্তন, শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে কীর্তন) বিয়ের গান, বিভিন্ন ধরনের ছড়া ও লোকগান, লোককাহিনি, প্রবাদ, ধাঁধা, লোকনাটক (গম্ভীরার আদলে), মানবপুতুল নাচ, চড়কপূজার গান (অষ্টগান), বিভিন্ন প্রকার ব্রতপূজার গান আদিবাসীদের নৃত্যগীত ইত্যাদির চর্চা হতে দেখা যায়।

'মালো' জনজাতির পরিচয় :

মূলত মৎস্যজীবী মালো সম্প্রদায় (ঝালো-মালো) প্রাচীন জানজাতি। মৎস্য শিকার সুপ্রাচীন পেশা। জলাভূমি, মাছের প্রতুলতা এবং মৎস্যজীবী সম্প্রদায়-পরস্পর কার্যকারণ সূত্রে গাঁথা। মালদহ বহু প্রচীনকাল থেকেই জলাভূমি (হ্রদ -দহ) সমৃদ্ধ জেলা (Lake district of Bengal - নামেও খ্যাত)। এই জলজ সম্পদের (মাছ) প্রতুলতার কারণে এবং দেশভাগ জনিত উদ্ধাস্ত মানুষের আগমনে এই জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা নেহাত কম নয়।

খাদ্যরসিক বাঙালিকে মাছে-ভাতে রাখে যে জাতি বা সম্প্রদায়— এক কথায় তারা মৎস্যজীবী। বংশগত মৎস্যজীবী ও শুধুমাত্র পেশাগত মৎস্যজীবী— এই দুই ভাগে বিভক্ত মৎস্যজীবী সম্প্রদায়। বংশগত মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে মালো, ঝালো-মালো, কেওট, কৈবর্ত, গৌড়ীয় মালো (গুড়ি মালো), বিন্দ, রাজবংশী উল্লেখযোগ্য। পেশা হিসাবে যারা মৎস্য শিকারের সঙ্গে যুক্ত এই জেলায় তাদের সংখ্যাও কম নয়। এই বিভাগগুলিও অনেক উপরিভাগে বিভক্ত। মালদহ জেলার দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশে প্রতিবেশী রাজ্যগুলি থেকে (বিহার, ঝাড়খণ্ড) প্রতিবেশী

দেশ বাংলাদেশ থেকে এসে এই জেলায় বসবাস করছেন অনেক মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ।

কোথা থেকে এই জাতির উদ্ভব-এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত প্রচলিত আছে। অনেকের ধারণা রাজস্থানের মল্লগড় বা মালোয়াড় বাসীদের সঙ্গে মানোট শব্দের যোগ, আবার কারো মতে রাজস্থানের ঝালোয়ার থেকে ঝালো কথাটি এসেছে। বর্তমানে 'বাংলাদেশে' 'ঝালো-মালো'/'মালো' বলতে একই সম্প্রদায়কেই বোঝায়।

মালদহ জেলার প্রায় সর্বত্র (জলাভূমি সংলগ্ন) এই মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের বাস—জেলার উত্তর এবং পশ্চিম প্রান্তে হরিশ্চন্দ্রপুর (১, ২), চাঁচল (১, ২), রতুয়া (১, ২), মানিকচক, ইংরেজবাজারের পশ্চিমাংশ কালিয়াচক-১, ২, ৩ এই ব্লকগুলিতে সাবেক মালোদের বসবাস অধিক। এরা সাবেক মালো বা গৌড়ীয় (গুড়ি মালো) মালো। কিন্তু গাজোল, বামনগোলা, হবিবপুর, ওল্ডমালদা, ইংরেজবাজারের পূর্ব প্রান্ত মূলত বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন ব্লকগুলিতে অভিবাসিত মালোদের বসবাস অধিক। [২৪]

তথ্য সূত্র :

১. মালদহ নামকরণের নেপথ্যে এম.আতাউল্লাহ, উত্তরের সারাদিন, ১৬ জুলাই ২০১২,
- আমার কিশোর জীবনের হারিয়ে যাওয়া গৌড়, তুষারকান্তি ঘোষ, আমাদের মালদহ, ২৫ মার্চ ২০০৪
- মালদহ জেলার ইতিহাস, প্রদ্যোত ঘোষ

২. পৌন্ড্রবর্ধন পথের কথা —অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, মালদহ চর্চা— ১, পৃ: ২৯৫

৩. উৎসারিত আলো, ৪র্থ বর্ষ। ২য় সংখ্যা। সন ১৪২০, অক্টোবর২০১৩, পৃ: ১১, ৩১, ৩৫, ৪৪, ৫২
- 'মালদহ' ধর্মীয় ঐতিহ্য ও লোকউৎসব, সুস্মিতা সোম
- মালদহ জেলার ইতিহাস, প্রদ্যোত ঘোষ

৪. মালদহ জেলার ইতিহাস, প্রদ্যোত ঘোষ, পৃষ্ঠা: ২৭-৩৬

৫. গৌড়ের ইতিহাস : রজনীকান্ত চক্রবর্তী

৬. উৎসারিত আলো : সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৩

৭. গৌড়ের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড), রজনীকান্ত চক্রবর্তী,
- মালদহ জেলার ইতিহাস, প্রদ্যোত ঘোষ

৮. মালদহ জেলার ইতিহাস, প্রদ্যোত ঘোষ

৯. উৎসারিত আলো : সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা, ৪ র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা,
- মালদহ চর্চা-১, সম্পাদক মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য।

১০. G.E. Lambourn-Bengal District Gazatters Malda (Calcutta -1918)– Page -2
- মালদহ জেলার ইতিহাস, প্রদ্যোত ঘোষ

১১. মালদহ জেলার ইতিহাস, প্রদ্যোত ঘোষ

১২. মালদহ মীন দপ্তরে দেওয়া তথ্য অনুসারে (২০১১সাল)

১৩. নদী বিজ্ঞানের আলোকে মালদহের নদনদী : একটি সমীক্ষা।
মালদহ চর্চা-১ সুপ্রতিম কর্মকার
মালদহ জেলার নদনদী, আবদুস সামাদ

১৪. ক্ষেত্রসমীক্ষা

১৫. মালদহ চর্চা-১, মালদহ জেলার জলাভূমি এবং তার জীববৈচিত্র্য : মনোরঞ্জন চৌধুরী

১৬. স্বদেশচর্চা লোক, বাংলার দীঘি, জলাশয় ২, মালদহ জেলার জলাশয়, ফনী পাল

১৭. W.W.Hunter-A Statistical Accounts of Bengal Vol- VIII, P-42-44

১৮. Census report -2011– Internet থেকে সংগৃহীত
১৯. মালদহ জেলার দক্ষিণ অংশের বাংলা কথ্য ভাষা : ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, সুজয় ঘোষ
- মালদা জেলার ইতিহাস, প্রদ্যোত ঘোষ
- বাংলার জনজাতি ১, প্রদ্যোত ঘোষ
- ভারতীয় জাতিবর্ণপ্রথা, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
- মালদহ চর্চা-১ (মালদহ জেলার জাতি জনজাতি, সুস্মিতা সোম)

২০. মালদহ জেলার দক্ষিণ অংশের বাংলা কথ্য ভাষা : ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, সুজয় ঘোষ
২১. মালদহ জেলার দক্ষিণ অংশের বাংলা কথ্য ভাষা : ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, সুজয় ঘোষ
২২. হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি (প্রচ্ছদ থেকে), গোলাম মুরশিদ
২৩. সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
২৪. ক্ষেত্রসমীক্ষা